মিলক গ্রহে মানুষ
বিজ্ঞান যাদের হাতে,
তাদের শিউরে ওঠা
ষড়যন্ত্র.....

মিলক গ্রহে মানুষ

অদ্রীশ বর্ধন
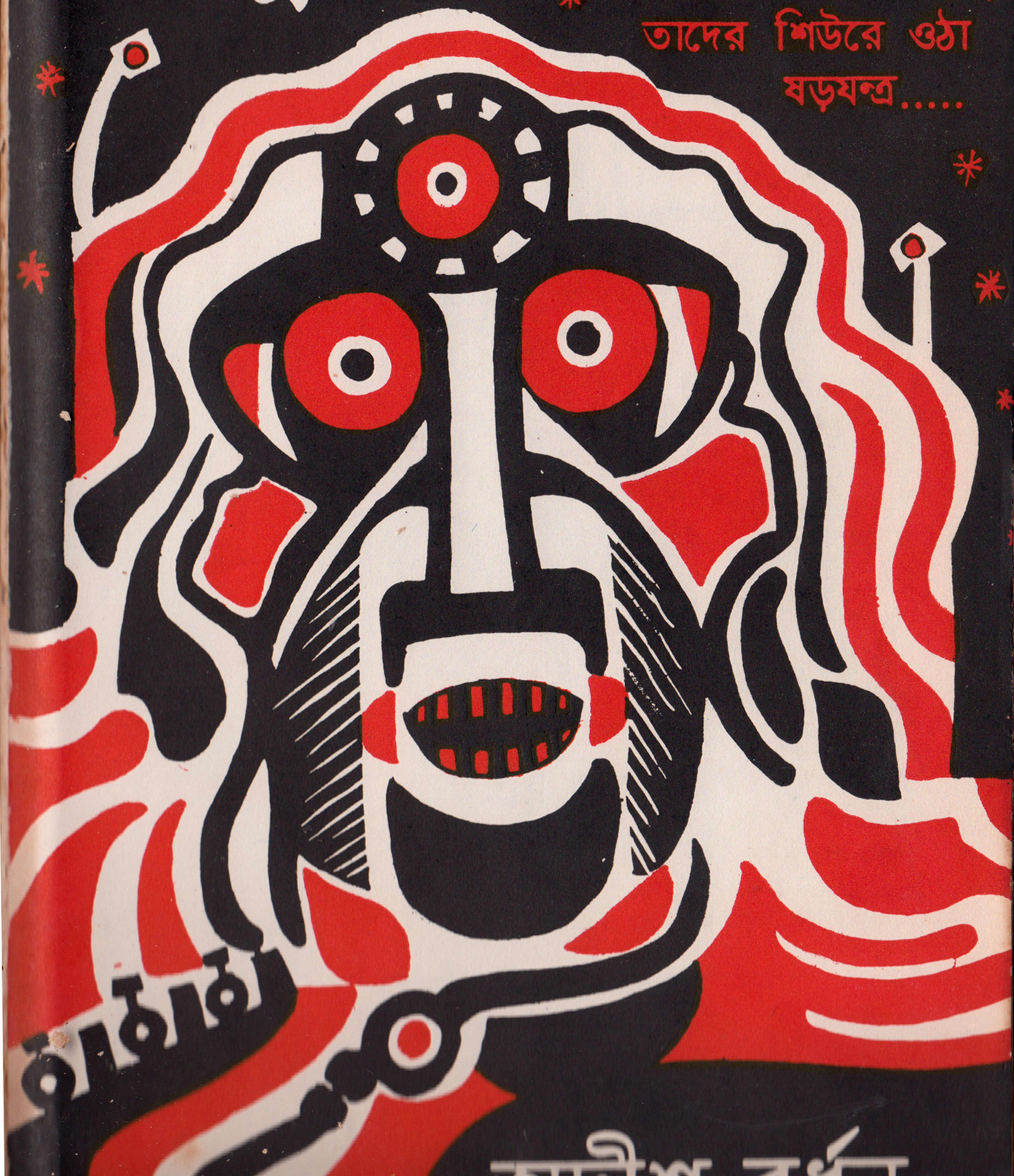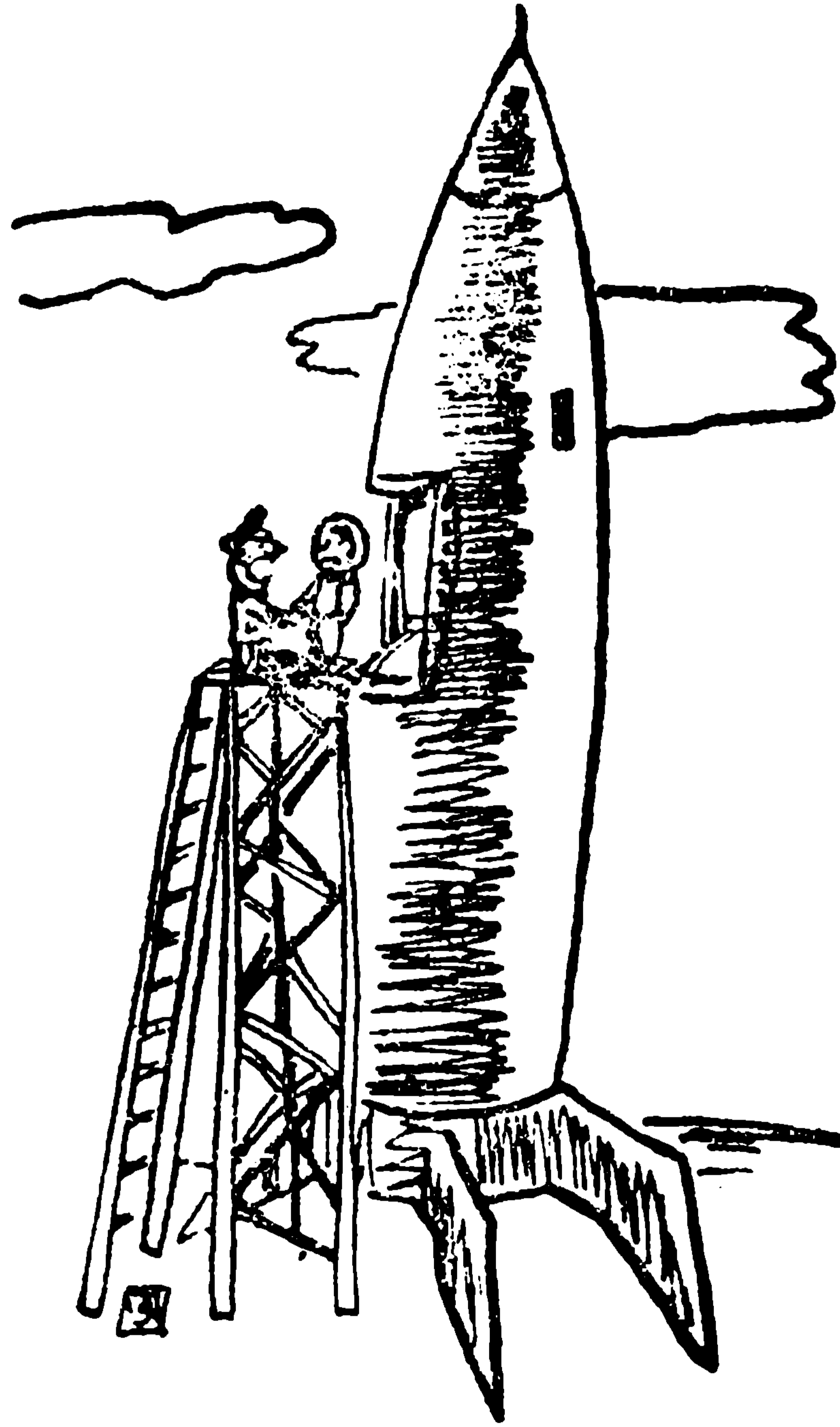
ফ্যানট্যাসটিক প্রকাশনা
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-১৪
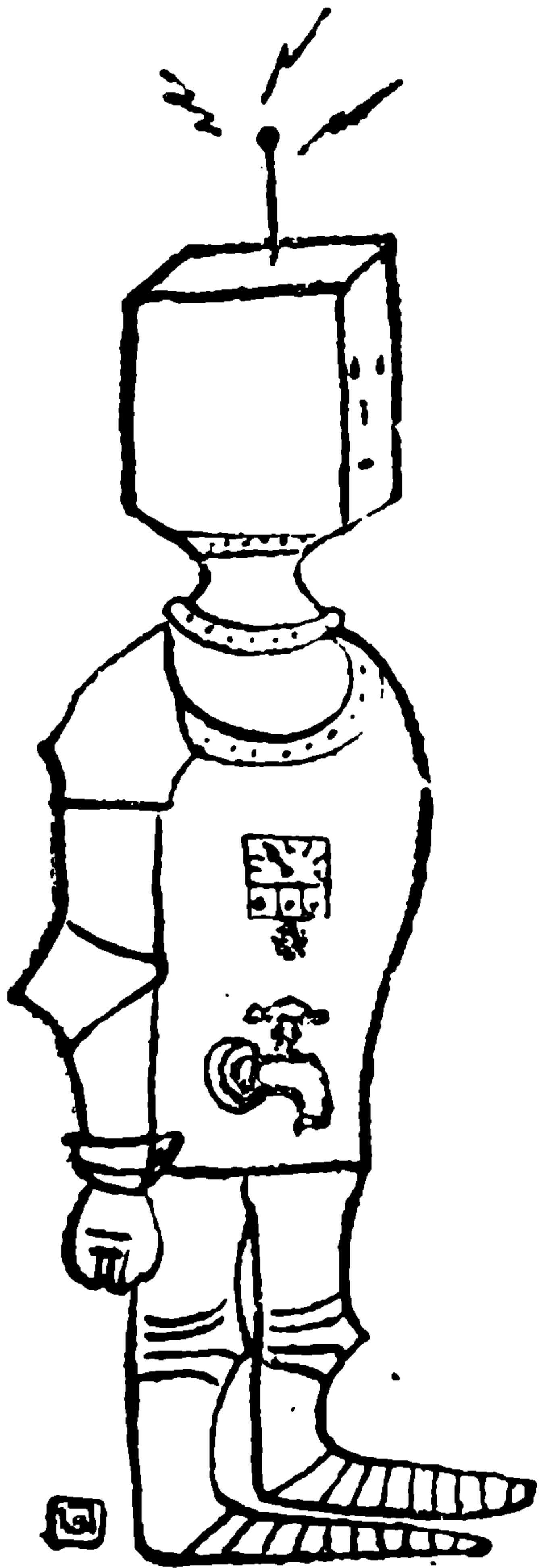
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪
প্রকাশক এবং মুদ্রক যথাক্রমে ফ্যানট্যাসটিক
প্রকাশনা এবং দীপ্তি প্রিণ্টার্স, ৪, রামনারায়ণ
মতিলাল লেন, কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ ঃ নিতাই ঘোষ

দাম ঃ চার টাকা
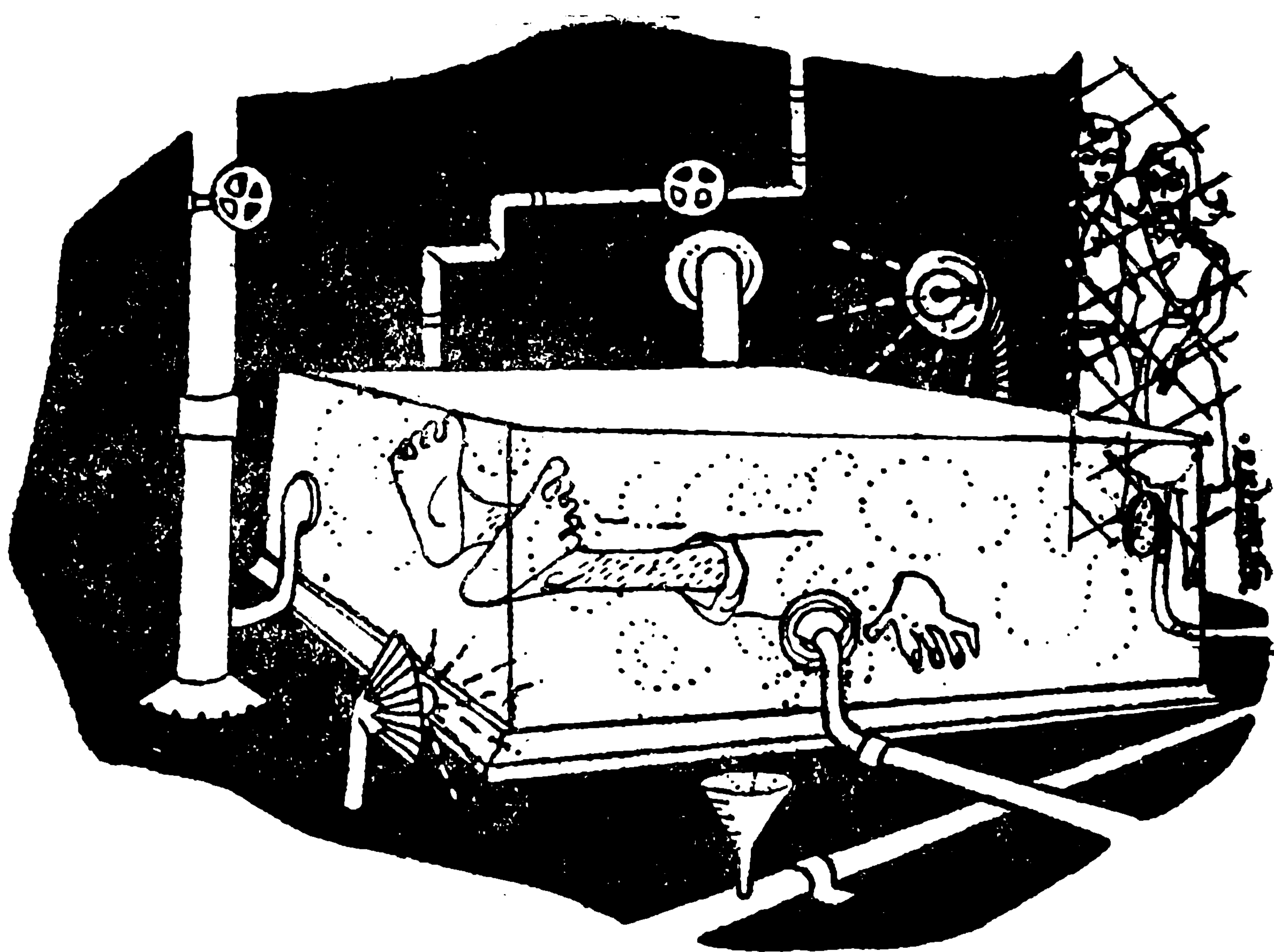
মিলক গ্রহে মানুষ

যাত্রা হ'ল শুরু (১)

আজ হতে বিশ বছর পরে।·····

মস্ত এক প্রাঙ্গণের মাঝে সারি সারি দাঁড়িয়ে পনেরোটি রকেট-বিমান। পুরো একটি স্কোয়াড্রন আজ পৃথিবী ত্যাগ করবে। বিশাল বিশাল রকেটগুলোর চারপাশে তাই জেগেছে কর্মচাঞ্চল্য, সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে তাদের রুপোলী ধাতব দেহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবিক জানোয়ারের মত সূচালো নাক আকাশের দিকে তুলে নিস্পন্দ দেহে তারা প্রতীক্ষমান।···

এগিয়ে আসে চরম মুহূর্ত। তীক্ষ্ণ, তীব্র সাইরেনের আকাশ চেরা শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় গভীর নৈঃশব্দ্যের মাঝে। তারপর···

দশ······নয়······আট······সাত······ছয়······পাঁচ······চার······তিন···
···দুই······এক···

আচমকা অগণিত বজ্রপাতের কানের পরদা ফাটানো দারুণ শব্দে থর থর করে কেঁপে ওঠে আকাশ-বন-প্রান্তর ; চোখ ধাঁধানো হাজার হাজার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে রকেটগুলোর পেছনে ; রাশি রাশি ধোঁয়া, আগুন আর বিকট গর্জনে মুহ্যমান হয়ে পড়ে সবাই।

কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর সম্বিৎ যখন ফিরে আসে, তখন নীল আকাশে সাদা ধোঁয়ার রেখা জাগিয়ে চকচকে বর্শা-ফলকের মত পনেরোটি রকেট-বিমান অকল্পনীয় গতিতে প্রবেশ করছে মহাশূন্যের মাঝে।

তারপরেই ধোঁয়া ছাড়া রইল না আর কিছুই।···

স্বর্গ ? (২)

একটা রকেটের কন্ট্রোল রুমে বসেছিল ওরা তিনজনে—কম্যাণ্ডার পার্নকিন, মেজর ধীমান ব্যানার্জী আর ক্যাপ্টেন লাইলা। এ রকেটের যাত্রী শুধু এই তিন জনই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ওরা। রাশিয়া থেকে এসেছে কম্যাণ্ডার পার্নকিন। সাত ফুট লম্বা অসুরের মত তার চেহারা। নীল চোখে এক বেপরোয়া দীপ্তি। ক্যাপ্টেন লাইলা আমেরিকার প্রতিনিধি। ঢেউ খেলানো ঝিলমিলে সোনালী চুলের নিচে তার মিষ্টি মুখটি দেখে কারও বোঝার সাধ্য নেই যে এ মেয়েরও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা থাকতে পারে। থট-রিডিং অর্থাৎ চিন্তা পঠনের একটা আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করে ও দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ কিছু না, হেডফোনটা শুধু কানে লাগালেই হল। অপরের চিন্তা ইথারে যে তরঙ্গ তুলছে, তাকেই গ্রহণ করে যন্ত্রটি রূপায়িত করবে বিশেষ এক শব্দ তরঙ্গে। অভ্যাসের ফলে সে শব্দ তরঙ্গের অর্থ বুঝে নেওয়া লাইলার পক্ষে কঠিন নয় মোটেই। আর তাই আমেরিকার প্রগতিশীল মহিলা সমিতি ওকে পাঠিয়েছে ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীদের ভাষা পাঠ করার জন্যে।

বাংলা থেকে এসেছে মেজর ধীমান ব্যানার্জী। ভারতীয় আণবিক সংস্থায় বিশ বছর ধরে গবেষণা করে পৃথিবীর দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছে সে।

দু'মাস হল পৃথিবীর ঘাঁটি ছেড়ে এসেছে ওরা। একটানা একঘেয়ে যাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল ধীমান। তাই বিরক্তি আর চাপতে না পেরে গজ গজ করে ওঠে,—'কি ব্যাপার বলো তো পানকিন? এ ভাবে হাত পা গুটিয়ে আর কাঁহাতক বসে থাকা যায়?'

হাতির দাঁতের মত ধবধবে সাদা লিভার দুটো দু'হাতে ধরে রুপোলী পর্দায় চোখ রেখে বসেছিল পানকিন। এ রকেটের কম্যাণ্ডার হলেও ধীমানের বন্ধুস্থানীয় সে। ওর ঝাঁঝালো গলা শুনে হাসি মুখে বললে, 'তুমি তো জানই, ফ্ল্যাগ অফিসারের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করার উপায় নেই আমাদের।'

'কিন্তু তিনিই বা কেন ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে রয়েছেন বুঝি না!'

উত্তর না দিয়ে হঠাৎ লিভারটা ঘুরিয়ে দিলে পানকিন—একটু দুলে ওঠে রকেটটা। চকিতে পর্দার ওপর ভেসে ওঠে তীরের মত এগিয়ে আসা একটা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। চোখের পলক ফেলার আগেই সাঁৎ করে পাশ দিয়ে পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায় আগুনের গোলাটা।

সংঘর্ষ বাঁচিয়ে উত্তর দেয় পানকিন—'ছায়াপথের যে অংশে আমাদের স্কোয়াড্রন চলেছে, তারই এক প্রান্তে নতুন একটা গ্রহ দেখা গেছে। নাম মিলক। আকারে আয়তনে মিলক-গ্রহের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কক্ষপথে পৃথিবীর যা গতিবেগ আর যে রকম অবস্থান, মিলকেরও প্রায় তাই। আজ পর্যন্ত সেখানে কেউ যায় নি বটে, তবে সম্প্রতি একটা সার্ভে-রকেট দূর-মাত্রার একটা ফটো তুলে দেখিয়েছে যে মিলকে মানুষের মত উন্নত প্রাণী থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর তাই আমাদের তিনজনের এই অভিযান চলেছে মিলকে। আমার তো মনে হয় অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা, আর বেশী দেরী নেই।

নিরুত্তরে বিরাট পর্দার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ধীমান। বিচিত্র ছবির পর ছবি ভেসে আসছে ঝিলমিলে পর্দাটার ওপর, চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে। অনন্ত অন্তরীক্ষের অসীম রহস্যের অতলে ও তলিয়ে যায় ক্ষণেকের জন্যে। সমুদ্রতীরে বালুকাকণার মত কোটি কোটি সূর্য ছড়িয়ে আছে এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে; পরিচিত সৌর-জগৎ ছাড়িয়ে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে ধেয়ে চলেছে তারা এই কোটি জগতেরই আর একটির দিকে। তবুও এই অনন্ত রহস্যের সমাধানও কি মানুষ আজ করতে পেরেছে? বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ও তাকিয়ে থাকে পর্দার ওপর ভেসে আসা অপরূপ দৃশ্য-তরংগের দিকে।

অকস্মাৎ মাথার ওপর লাল আলো জ্বলে ওঠে। তারপরেই ভেসে আসে ফ্ল্যাগ-অফিসারের আদেশ।

'কম্যাণ্ডার পানকিন। তৈরী ?'

'ইয়েস, স্যার,' জবাব দেয় পানকিন।

'তাহলে এবার ডাইনে মোড় নাও। শুভেচ্ছা রইল। বিদায়।' নিভে যায় লাল আলো।

মিলকের দিকে বাঁক নেয় রকেট। ধেয়ে চলে অবিশ্বাস্য বেগে—দেখতে দেখতে বহু পিছনে হারিয়ে যায় স্কোয়াড্রনের অপর রকেটগুলো। পানকিন বলে—'গণনা নির্ভুল হলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পেঁছে যাব আমরা।'

ধীমান আর লাইলা কোন উত্তর দেয় না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে পর্দার ওপর। কিন্তু হীরের কুচির মত অপসৃয়মান নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়া মিলকের কোন চিহ্নই তখন ফুটে ওঠেনি পর্দার বুকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেসে ওঠে আলোর ফুটকির মত কতকগুলো তারা। অন্ধকারের বুকে যেন কয়েকটি প্রদীপকণা। আরও কাছে এগিয়ে যায় রকেট; দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে ফুটকিগুলো। তারপরেই ম্যাজিকের মত পর্দার ওপর ভেসে ওঠে বহুরঙা মস্ত বড় জ্বলজ্বলে একটা গোলক।

'মিলক!' বলে পানকিন

'বাব্বা, বাঁচা গেল,' খুশী খুশী স্বরে বলে ওঠে ধীমান। 'এবার তাহলে নামার পালা। লাইলা, মিটার দেখ।'

খুব সাবধানে দক্ষ হাতে রকেটের মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলে পানকিন—ফলে শক্তিশালী জেটগুলো মিলকের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দারুণ টান অনেকটা কমিয়ে দিলে। আর এই প্রচণ্ড বিপরীতমুখী শক্তির চাপ থেকে রেহাই পাবার জন্যে ওরা তিনজনেই সিটের সঙ্গে নিজেদের বেল্টে বেঁধে ফেলে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে নরম কুশনের উপর। পানকিনের হাত রইল যন্ত্রপাতির ওপর। পাশ থেকে ধীমান আর লাইলা মিটার দেখে দেখে হুঁশিয়ার করে দিতে লাগল পানকিনকে।

খুব আস্তে আস্তে নেমে এল বিরাট বিমানটা। মাথার ওপরকার পর্দায় ফুটে উঠল মিলকের ছবি। যতই নিচে নামতে লাগল রকেট, ততই আবছা সবুজ ছোপগুলোর মধ্যে থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল চারকোনা জমির পর জমি।

পানকিন বললে—'ব্যানার্জী, ও পাশের ঐ সবুজ রঙের চারকোনা জমিটায় নামব। তুমি আর লাইলা চটপট অংক কষে পথ বাৎলাও।'

সারি সারি রকমারি ডায়াল আর মিটারের চঞ্চল কাঁটাগুলো দেখে দ্রুত অঙ্ক কষতে লাগল ওরা দু'জন। আর নির্দেশমত পাকা হাতে একটার পর একটা জেটে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রকেট-বিমানকে চারকোনা জমির ঠিক ওপরে নিয়ে এল পানকিন। দেখতে দেখতে সমস্ত পর্দা জুড়ে ভেসে রইল জমিটা। যন্ত্রপাতি থেকে জানা গেল জমি খুবই মসৃণ—মোটেই এবড়ো খেবড়ো নয়। রকেট নামাবার আদর্শ জায়গা।

বিমানের গতিবেগ যতই শূন্যের দিকে এগোতে লাগল, ততই যে দারুণ

শক্তিটা ওদের কুশনের ওপর চেপে ধরেছিল, তা একটু একটু করে কমে আসতে লাগল, আরও স্বচ্ছন্দভাবে গা এলিয়ে দিয়ে শুল ওরা। টুকরো টুকরো কথা ছাড়া কণ্ট্রোলরুমে নেমে এলে গভীর নৈঃশব্দ্য। রকেটটি তো আর নিতান্ত ছোট নয়—তাকে নিচে নামানোও রীতিমত কঠিন কাজ। সামান্য একটু ভুলের জন্য শুধু রকেট কেন, ওদের জীবনও খতম হয়ে যেতে পারে নিমেষের মধ্যে। খুব সাবধানে, অনেক হিসেব করে পার্নাকিন তাই নামাতে থাকে বিমানটা।

ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ধীমান। রকেট নিরাপদে মিলকের মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত। খটাখট করে সব কটা জেট বন্ধ করে দিয়ে চট করে লাফিয়ে উঠল পার্নাকিন—'ব্যানার্জী, উঠে পড়ো। বাতাসটা বিশ্লেষণ করে দেখে নাও! কুইক!'

বাতাস পরীক্ষা করার যন্ত্রটাকে চালু করে দিয়ে তিনজনেই এগিয়ে গেল পোর্টহোলের দিকে। বোতাম টিপতেই মস্ত বড় চাকতিটা আস্তে আস্তে ঢুকে গেল পাশের খাঁজে। আর পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে ওদের বিস্মিত চোখের সামনে জেগে উঠল এক অপরূপ দৃশ্য।

বহুদূর পর্যন্ত সবুজ, মসৃণ ঘাসজমি চলে গেছে—তারও ওধারে লম্বা সবুজ গাছের সারি, উঁচু উঁচু সবুজ পাহাড়, মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সবুজ প্রান্তর। এপাশে ওপাশে দিগন্ত-বিস্তারী মাঠে ঝলমল করছে সোনালী শস্যের অকৃপণ প্রাচুর্য। হলুদ ফিতের মত আঁকা বাঁকা পথগুলো দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে বহুদূরে। যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজ সোনালী আর হলুদ রঙের উৎসব লেগেছে প্রকৃতির কোলে—অপরূপ দ্যুতিতে ঝলমল করছে তাঁর আঁচলভরা অজস্র সম্পদ। কিছুক্ষণ এই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে গভীর প্রশান্তিতে মন প্রাণ ভরে ওঠে—মিলকের দিগন্তপ্রসারী শান্তি আর সৌন্দর্য অন্তরের শূন্য কোণগুলোও যেন ভরিয়ে তোলে।

'অপূর্ব!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে লাইলা। 'এত সুন্দর গ্রহ আমি আর কখনও দেখিনি।'

ধীমান বলে—'বাস্তবিকই পার্নাকিন, এত সবুজ রঙ কি আর কোথাও দেখেছ তুমি? সমস্ত মিলক গ্রহটাই যেন সবুজ জলে স্নান করে হলুদ আর সোনালী রঙের গয়না পরেছে. তাই না?'

পার্নাকিন কিছু বলে না—শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে বাইরে।

'ক্লিং' করে একটা শব্দ হতেই সম্বিৎ ফিরে আসে ওর। এগিয়ে যায় গ্যাস বিশ্লেষণ যন্ত্রটার দিকে। বাইরে থেকে বাতাসের একটু নমুনা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে পরীক্ষা করে চলেছিল মেশিনটা। সরু একটা ফিতের ওপর ফলাফলটা লেখা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

'বাতাস ঠিকই আছে হে। বিষাক্ত কিছু নেই। আমাদের পৃথিবীর মতই। বাতাসের চাপও প্রায় একরকম—সামান্য একটু বেশী। তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

স্যুট পরার কোন দরকারই এবার নেই।'

মহাকাশযান যাত্রীদের আধুনিক স্যুট একটা আশ্চর্য জিনিস। গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে এয়ার টাইট রবারের এক স্যুট; তার ওপরে থাকে নাইলনের মতো সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে তৈরী দু'নম্বর পোশাক। মানুষের দেহ যে উত্তাপ এবং বায়ুর চাপে কর্মক্ষম থাকে ঠিক সেই উত্তাপ এবং চাপ এই পোশাকের মধ্যে বজায় রাখা যায় যতদিন খুশী। এই স্যুট পরে কোন অজানা গ্রহে দিনের পর দিন ঘোরাফেরা করলেও কোন ক্ষতি হয় না মহাকাশযাত্রীর। কিন্তু মিলকের অনুকূল হাওয়ায় তারও আর কোন প্রয়োজন রইল না।

'এস, এবার নেমে পড়া যাক কপাল ঠুকে!' সকৌতুকে বলে ধীমান।

'এয়ার-লকে'র সামনে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ায়। প্রথমে 'প্রেসার চেম্বার', পরে বাইরের হ্যাচটা খুলে যেতে একে একে সুদীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে ওরা নিচে জমির ওপর।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তে পাহাড় প্রান্তরের ওপর দিয়ে তীক্ষ্ন একটা স্বর কাঁপতে কাঁপতে ভেসে এল ওদের কানে। খুশীতে ডগমগ হয়ে খোশ মেজাজে যেন কোন কচি কণ্ঠ গলা ছেড়ে গান জুড়েছে মাঠের ওপাশে।

আচমকা তীক্ষ্ন সুরেলা শব্দটা শুনে চমকে উঠেছিল সবাই। পরক্ষণেই জোর গলায় হেসে ওঠে ধীমান, 'কি ব্যাপার হে পার্নাকিন? মিলকে প্রথম মোলা-কাৎ কি শেষ পর্যন্ত খোকাখুকুদের সাথেই হবে?'

'চলো দিকি, দেখে আসা যাক কি ব্যাপার।' বলে পার্নাকিন।

দূরে গাছের আড়ালে এক সার রঙীন পাখী দেখে মহা খুশীতে হাততালি দিয়ে ওঠে লাইলা, 'দেখো দেখো, ব্যানার্জী। এ স্বর্গ রাজ্য না হয়ে যায় না। এত সুন্দর পাখী আর কোথাও দেখেছো তুমি?'

'হুঁ! পাখীর চেয়েও আরও আশ্চর্য জিনিস রয়েছে তোমার জন্যে—দেখো ওদিকে!'

কিছুদূরে গাছের নীচে বসেছিল একটা লোক। মহা খুশীতে গান জুড়েছে সে-ই। আর সেই সাথে মহানন্দে লাট্টুর মত কিম্ভূতকিমাকার কি একটা জিনিস বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে মাটির ওপর।

বন্দী (৩)

অবাক হয়ে ওরা তিনজন মিলকের এই বুড়ো খোকা বাসিন্দার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটার চোখ, মুখ, দেহ অবিকল পৃথিবীর মানুষের মতো। পৃথিবীর হিসেবে বয়স তার বছর তিরিশ হ'বে। কিন্তু গলার স্বর ছেলেমানুষের মতো সরু। হাবভাবও কেমন জানি খোকা খোকা রকমের। তারস্বরে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এদের দিকে চোখ পড়তেই হাতের খেলনা আছড়ে

ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল লোকটা। ভয় ভয় চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

দেখে শুনে কোনমতে হাসি চেপে বললে পানকিন—'লাইলা, এবার তোমার কেরামতি দেখাবার পালা। আমাদের ভাষা তো ও বুঝবে না। তাই তোমার থট রীডার দিয়ে কথাবার্তা বল ওর সঙ্গে।'

ছোট ছিপির মত থট রীডার কানে লাগিয়েই মাটিতে নেমেছিল লাইলা। এখন পানকিনের আদেশে সে এগিয়ে গেল লোকটার পানে।

এই অবসরে চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলে ধীমান।

চারপেয়ে কতকগুলো জন্তু মাথা নিচু করে ঘাস খাচ্ছিল এদিকে ওদিকে। হুবহু পৃথিবীর ভেড়ার মত দেখতে তাদের। তফাৎ শুধু শিংয়ের গঠনে। এদের শিংগুলো আরও খাটো এবং বেশ সূচালো। গা ভরা কুঁচকোনো ঘন লোম।

আশ্চর্য হয়ে যায় ধীমান। মানুষ, গাছপালা, পশু, পাখী সবই অবিকল পৃথিবীর মত। চোখে না দেখলে এ রকম অদ্ভুত সাদৃশ্য কল্পনাতেও আসে না। সৌরজগতের বাইরে এতদূরে পৃথিবীর মত গ্রহে একই রকমের জীবনের অভিব্যক্তি যে থাকা সম্ভব—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না কিছুতেই।

লোকটার গায়ে একটা ময়লা আলখাল্লা, কোমরে চামড়ার বেল্ট। পায়ে বিদ্ঘুটে ধরনের এক জোড়া জুতো। এলুমুনিয়ামের মত ধাতব ঔজ্জ্বল্য থাকলেও তা ধাতুর নয়। এত পাতলা যে চামড়ার সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে রয়েছে। দেখে ধীমান এদের উন্নত পাদুকা শিল্পের তারিফ না করে পারে না।

ফিরে এল লাইলা।

সাগ্রহে শুধায় পানকিন—'কি ব্যাপার? কি বুঝলে?'

'আশ্চর্য! লোকটার মনটা একেবারে ছেলেমানুষী ভাবে ভরা। ছোটছেলের মন যেমন অপরিণত হয়, এরও তাই। ও বলছে আমাদের ওর সঙ্গে যেতে। যাবে নাকি?'

'নিশ্চয়!' সোৎসাহে বলে পানকিন। 'এসেছি যখন, তখন সবই দেখব বইকি।'

লাইলার ইঙ্গিতে লাট্টুর মত খেলনাটা তুলে নিয়ে বোকার মত হাসি হাসি মুখে লোকটা এগিয়ে চলে গাছের তলা দিয়ে। লম্বা লম্বা গাছের আড়ালে এদিকে সেদিকে ছড়ানো দু'একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। অনেকটা খামার বাড়ীর মতো দেখতে বাড়ীগুলো, কিন্তু অভিনব ফ্যাশানের তৈরী। স্থাপত্য শিল্প যে এদেশে যথেষ্ট উন্নত, তা বাড়ীগুলোর দিকে একবার নজর দিলেই বোঝা যায়।

একটু পরেই সুদৃশ্য একটা বাড়ীর সামনে হাজির হয় সবাই। লোকটা ফটক

পেরিয়েই দুপদাপ করে ছুট লাগায় ভেতর বাড়ীতে। একটু ইতস্তত করে ওরাও গুটি গুটি ঢুকে পড়ে ভেতরে।

নিখুঁতভাবে সাজানো ঝলমলে একটা বসবার ঘরে এসে দাঁড়ায় ওরা। হঠাৎ দেখলে চমক লাগে। মনে হয় যেন কোন প্রতিভাবান শিল্পী মনের মতো করে অজস্র আসবাবপত্র দিয়ে ছবির মত সাজিয়েছে ঘরটা।

বড় বড় চোখে লাইলা বলে—'অবাক কাণ্ড। এমন সাজানো ঘর এখানে দেখব, তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। ব্যানার্জী তুমি—'

মুখের কথা মুখেই রইল। লম্বা লম্বা পা ফেলে গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকল একটি ফুটফুটে ছেলে। বছর বারো বয়স। ছেলেটিকে দেখতে বড় সুন্দর। কাশ্মিরী আপেলের মত রাঙা গোলাপী গাল, ঘন কালো চোখ, সোনালী রঙের ঢেউ খেলানো এক মাথা রেশমের মত হাল্কা চুল আর চওড়া উন্নত কপাল।

কিছুক্ষণ সবাই নির্বাক। অপলকে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর জলতরঙ্গের মত মিষ্টি সুরে অদ্ভুত দ্রুত স্বরে কি যেন বললে ছেলেটি।

বিন্দুবিসর্গ বোঝে না এরা। পানকিন হো হো করে হেসে উঠে বলে—'খোকনমণি, তুমি তো আমাদের কথা বাবা বুঝবে না। তোমার বাপ মাকে ডেকে দাও দিকি, দুটো কথা বলি।'

নিরুত্তরে ছেলেটি পানকিনের আপাদমস্তকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। তারপর ভারিক্কী চালে এগিয়ে যায় ঘরের কোণে। অনেকটা টেলিফোন যন্ত্রের মত দেখতে একটা গাঢ় নীল রঙের মেশিনের হাতলটা তুলে নিয়ে গড় গড় করে একই রকম মিষ্টি সুরে এক নাগাড়ে কথা বলে যেতে থাকে সে। ছেলেটার অকুণ্ঠ চলাফেরা কথাবার্তা দেখে বেশ মজা পায় ধীমান আর পানকিন।

লাইলা কিন্তু হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করে ওঠে—'শয়তান!'

শয়তান! পানকিন তো রীতিমত ঘাবড়ে গেল। অমন ফুটফুটে ছেলেটা শয়তান হতে যাবে কেন?

উত্তেজিত ভাবে বলে লাইলা—'দেখতে সুন্দর হলে কি হবে। পাক্কা শয়তান ঐ ছোঁড়াটা। জানো ও কি বলছে?'

'কি?'

'সাঙ্গপাঙ্গদের ডেকে হুকুম দিচ্ছে আমাদের বন্দী করে এখুনি পাগলা গারদ জাতীয় কোথায় আটকে রাখতে।'

'পাগল নাকি, নিয়ে গেলেই হ'ল। হাতিয়ারগুলো কি তাহলে বৃথাই আনলাম।' বলে সস্নেহে হোলস্টারের আণবিক পিস্তলটার ওপর একবার হাত বুলিয়ে নেয় পানকিন।

যন্ত্রটার সামনে কথা বলতে বলতে অদ্ভুত দৃষ্টিতে লাইলার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করছিল ছেলেটা। এখন পানকিনকে হোলস্টারে হাত দিতে দেখে

হাতলটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল ওর সামনে। এসে নীরবে হাত বাড়িয়ে দেয় অস্ত্রটার দিকে। এক পা পিছু হটে আসে পানকিন। বলে, 'বেশী ডেঁপোমো কোরো না ছোকরা। বাড়াবাড়ি করলে একটি থাপ্পরে—'

অদ্ভুত একটা আলো জ্বলে ওঠে ছেলেটার চোখে। পানকিনের চোখে চোখ রাখে সে। পর মুহূর্তে পানকিন দেখলে হোলষ্টারের অটোমেটিক চলে গেছে ছেলেটির হাতে।

চমকে ওঠে ধীমান—'একি করলে পানকিন? অটোমেটিকটা ঐ বাচ্চা ছেলেটার হাতে দিয়ে দিলে? কি কাণ্ড করে বসে দেখ দিকি।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় পানকিন—'আমি কখন দিলাম? কি করে যে পিস্তলটা হাতে গেল ওর, তা-ও তো ছাই বুঝছি না।'

'আমি জানি কি করে গেল।' রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে লাইলা। 'তখনই বললাম আস্ত শয়তান ঐ ছোঁড়াটা। তোমাকে সম্মোহন করেছিল পানকিন। হিপ্‌নোটাইজ করে তোমাকেই দিতে বাধ্য করলে অটোমেটিকটা।'

'বটে।' চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে পানকিনের। 'নিকুচি করেছে তোর শয়তানির।' দু-হাতে ছেলেটাকে শূন্যে তুলে একটা সোফায় বসে নিজে কোলে বসায় তাকে, তারপর হাত তোলে শূন্যে······

পরের মুহূর্তেই সে দেখে ছেলেটা দাঁড়িয়ে তার সামনে। দুই চোখে তিরস্কার ফুটিয়ে যেন গম্ভীরভাবে শাসন করতে থাকে পানকিনকে।

হো হো করে হেসে ওঠে ধীমান,—'সাবাস পানকিন! তুমিও হাত তুললে, ছেলেটাও গুট গুট কোল থেকে নেমে এল। কি ব্যাপার হে!'

হতভম্ব হয়ে বসে রইল পানকিন। আচমকা হুড়মুড় করে একদল ছেলে এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে। প্রত্যেকের পরনে লাল টুকটুকে ইউনিফর্ম—সোনালী ষ্ট্রাইপ। প্রত্যেকটি ছেলেই ফুটফুটে সুন্দর—কিন্তু চালচলন একটু ভারিক্কী। প্রথম ছেলেটিকে সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়ায়—তড়বড় করে কথা বলতে থাকে ছেলেটি, আর অটোমেটিকটা তুলে ঘন ঘন আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকে এদের তিনজনকে। দুগ্ধপোষ্য বালকগুলোর মাতব্বরি চালচলন দেখে বেজায় হাসি পেয়ে যায় ধীমানের।

কিন্তু প্রাণ খুলে হাসবার আগেই ওরা এদেরকে ঘিরে ধরে। তারপর ইঙ্গিত করে বাইরে বেরোতে।

'কি হে, যাবে নাকি?' শুধোয় ধীমান।

ঠোঁট উলটোয় পানকিন—'একপাল বাচ্চা খোকার হাত এড়িয়ে পালানোর মতলব আঁটাটাও তো হাস্যকর ব্যাপার। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।'

বাইরে বেরিয়ে সেই প্রথম ওরা দেখলে অদ্ভুত ধরনের একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে বাড়ীর সামনে।

অতি আধুনিক জেট মডেলে তৈরী গাড়ীটা বেজায় ঝকঝকে সোনালী রঙের একরকম ধাতুতে আগাগোড়া ঢাকা। একপাশে গাঢ় রক্তবর্ণের একটা ত্রিভুজের ওপর হীরের মত ঝলমলে পাথরের একটা তীর। তীরটা একজন স্পর্শ করতেই নিঃশব্দে ত্রিভুজটা সরে গেল পাশে।

বিচিত্র এই যন্ত্রযানে উঠে বসে তিনজনে।

হলুদ পথ ধরে এঁকে বেঁকে মসৃণ গতিতে গাড়ীটা এগিয়ে চলল। ক্রমশঃ চওড়া হ'তে থাকে পথ—শেষে গাড়ী এসে ঢোকে মস্ত এক শহরে। যেদিকে দু'চোখ যায়, অগণিত প্রাসাদ সারি সারি চলে গেছে দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে। মাঠ-বনের আড়ালে যে এত বড় প্রাসাদ লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কল্পনাই করতে পারে নি ওরা। আর সে কি প্রাসাদ এক একটা, যেমন বিপুল তাদের বিস্তার, তেমনি আকাশ ছোঁয়া উঁচু তাদের মাথা। বিচিত্র-গঠন খিলানে, অপূর্ব সুন্দর দেওয়ালে অপরূপ কারুকাজ। জানলায় পুরু কাঁচের মত স্বচ্ছ পদার্থের শার্শি—তার ওপরেও সূক্ষ্ম অলংকরণ। হতবাক হয়ে ওরা তাকিয়ে রইল এই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ-নগরীর দিকে।

পথে হরেক রকম যানবাহনের ভীড় ঠেলে ওদের গাড়ী এসে দাঁড়াল এমনি এক বিপুল সৌধের সামনে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে লাল পোশাক পরা ছেলে-গুলো। নেমে এমনভাবে ওদের ঘেরাও করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে চলল, যেন এ বাড়ীর সব কিছুই তাদের নখদর্পণে।

জ্যামিতিক নকশা কাটা চকচকে ব্রোঞ্জের মত ধাতুর তৈরী একটা দরজার পাল্লাটা ওপরে উঠে গিয়ে পথ করে দিলে। ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপরেই আচমকা ছেলেগুলো লাইলাকে ঘেরাও করে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। পলকের মধ্যে নেমে এল দরজার পাল্লা। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে এরা দু'জন হাত তোলবারও অবসর পেলে না।

দরজার পাল্লা নেমে এসে পথ বন্ধ করে দিতেই লাফিয়ে এগিয়ে গেল ধীমান। দুমদাম করে লাথি মারতে থাকে দরজার ওপর। কিন্তু বৃথা! মজবুত দরজা তাতে এক চুলও নড়ল না। রেগে টং হয়ে হাত দেয় হোলষ্টারে, অটোমেটিক দিয়ে দরজা গলিয়ে যাবে ওপাশে।

কিন্তু হোলষ্টার শূন্য! কোন ফাঁকে ওর অটোমেটিকটাও টেনে নিয়েছে হতচ্ছাড়া ছেলেগুলো।

হতাশ হয়ে বসে পড়ল ধীমান।

পার্নাকিন কিন্তু আগাগোড়া চুপ করে ভাবছিল। এখন বললে—'ব্যানার্জী, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?'

'কী'

'পৃথিবীর সঙ্গে মিলকের বাহ্যিক অনেক সাদৃশ্য থাকলেও এসে পর্যন্ত কতকগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে আমাদের। মনে করে দেখো, এ দেশে

পা দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শুধু একজনকেই দেখেছি —আর কচি খোকার মতই মনের গঠন তার। কিন্তু ছেলেমানুষ যাদের দেখছি, তাদের প্রত্যেকেই চালচলনে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো। মিলকের রীতিনীতি সবই উল্টো। দেশের শাসন নাবালকদের হাতেই। মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখো। কোন গারদে এ ধরনের ছেলে ভুলোনো খেলনা থাকে না—থাকে নার্শারীতে।'

মগজ (8)

'নার্শারী!' গোল গোল চোখ করে তাকায় ধীমান। 'তুমি কি তাহলে বল এই অর্বাচীন ছোকরাগুলো আমাদের বাচ্চা ছেলে ভেবে নার্শারীতে আটকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে?'

'মনে তো হচ্ছে তাই।'

'বটে! কিন্তু কতক্ষণ আটকে রাখবে হতভাগারা।' চারদিকে কটমট করে তাকাতে থাকে ধীমান।

কিন্তু পথ কোথায়? বহু উঁচুতে নাগালের বাইরে ছোট ছোট কয়েকটি শুধু খুপরি, ব্যস, আর কিছুই নেই।

পানিকনই প্রথমে লাফিয়ে ওঠে। ঠিক পিছনেই দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় মিলানো একটা দরজা এতক্ষণ ধীমানের নজরে পড়ে নি। পানিকন দেখামাত্র এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেললে দরজাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক দমকা বাতাসের মতই তুমুল হট্টগোলের একটা দারুণ আওয়াজ বেজে উঠল ওদের কানে।

দরজার ওপাশে ঘরের দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির হয়ে যায় ধীমানের।

বিশাল হলঘরে অগুন্তি পুরুষ। বয়স কারুরই পঁচিশ তিরিশের কম নয়। কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ তারস্বরে গান গাইছে আর পুতুল খেলছে, কেউ কেউ মুখে কু দিতে দিতে দৌড়োদৌড়ি করছে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে। কেউ হাততালি দিচ্ছে আর তালে নাচছে তাদের সঙ্গীরা।

ছানাবড়ার মতো চোখ করে খেড়ে খোকাদের এই আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার দিকে কতক্ষণ যে তাকিয়েছিল ধীমান, তা ও নিজেই জানে না। পানিকন ওকে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিতে সম্বিৎ ফিরে পায় ও। বিমূঢ় চোখে শুধোয় —'কি ব্যাপার বলো তো?'

মাথা চুলকে বলে পানিকন—'তাইতো ভাবছি হে, ব্যাপারটা বড় জটিল হয়ে উঠল দেখছি।'

'জোয়ান লোকগুলো কিন্তু পাগল নয় মোটেই। কিন্তু যে ভাবে কচি খোকার মতো খেলনা নিয়ে হুটোপাটি করছে—!'

আচমকা ব্রোঞ্জের দরজা উঠে গেল ওপরে, হাসি মুখে ভেতরে ঢুকলো লাইলা, সঙ্গে পাঁচজন লাল পোশাক পরা ছেলে।

বোমার মত ফেটে পড়ে ধীমান—'লাইলা, ওরা তোমার কোন ক্ষতি করেনি তো ? রাস্কেলদের ধরে আমি—'

মুচকি হেসে বলে লাইলা—'অত চটছ কেন ব্যানার্জী ? ক্ষতি কেন হবে, বরং ওদের আমি ইংরেজি শিখিয়ে এলাম।'

'এত অল্প সময়ের মধ্যে !' হাঁ হয়ে যায় পানকিন।

'হ্যাঁ, এরই মধ্যে। আমাকে প্রথমে দেখেই এদের সন্দেহ হয়েছিল যে নিশ্চয় অপরের চিন্তা পাঠ করার বিদ্যে আমার জানা আছে। তাই ওরা নিয়ে গেছিল আমায়।'

'কিন্তু—'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কম্যাণ্ডার পানকিন।' মিনমিনে মিষ্টি সরু গলায় একজন বলে ওঠে। 'ভাষা শিখতে আমাদের বেশী দেরী লাগে না। তাছাড়া তোমাদের এই মেয়েটি শেখায়ও খুব তাড়াতাড়ি।'

'বেশ, বেশ, চমৎকার,' টপ্ করে বলে ওঠে ধীমান। 'এবার বল দিকি খোকা, আমাদের ডেকে এনে এভাবে ফাজলামো করার কি অর্থ ?'

'খোকা নই, কিন্।'

'কিন্ ! সে আবার কি ?'

'আমার নাম। আর এরা হল মিন, টিন, চিন আর ডিন।'

খুক খুক করে হেসে ওঠে ধীমান। 'বাঃ, বাঃ, বেশ নাম। তা কিন ভায়া, ছন্দ মিলিয়ে নাম রাখাই বুঝি এদেশের রেওয়াজ ? কবিতা টবিতা নিশ্চয় খুব পড়ো তোমরা ?'

'তোমরা পৃথিবীতে যাদের পুলিশ বল, আমরা তাই। আমাদের প্রত্যেকের নাম 'ন' কারান্ত। এই একই পদ্ধতিতে অন্য কাজে যারা আছে তাদের নামকরণ হয়। যেমন ধরো না কেন, চাষবাস যারা করছে, তাদের নাম 'গ' কারান্ত। রাগ, বাগ, ডাগ, মাগ—এই রকম আর কি।'

এবার পানকিন শুধোয়—'কিন্তু ভায়া কিন, একটা জিনিস তো বড় গোলমেলে ঠেকছে। দেশে এত নওজোয়ান থাকতে তোমাদের মত নাবালকদের পুলিশ বাহিনীতে নেওয়া হল কেন ?'

পাল্টা প্রশ্ন করে কিন—'শুনলাম, তোমাদের পৃথিবীতে নাকি জোয়ান খোকাদের হাতেই দেশের শাসনভার। একি সত্য ?'

ধাঁ করে পানকিনের মেজাজ বিগড়ে যায়—'তবে কি তোমাদের মত অর্বাচীন ছোকরাদের হাতে দেশটা ছেড়ে দেবো ? এই এতগুলো আলোক-বর্ষ * পেরিয়ে পৃথিবী থেকে এসেছি তোমাদের ডেঁপোমো শোনার জন্য ?'

---

* এক বছরে একটা আলোর রেখা ৫৮৪৮,000,000,000 মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। এই দূরত্বটাকেই বলে আলোক-বর্ষ।

চোখের ইসারায় পানকিনকে থামিয়ে দেয় ধীমান—'মাথা গরম করে কোন লাভ নেই বন্ধু।' এবার কিনের দিকে ফিরে বলে—'কিন ভায়া, আমাদের পিস্তলগুলো ফেরৎ দিয়ে এই পাগলাগারদ থেকে বেরোবার পথটা বাৎলে দাও দিকি। এভাবে নাহক আটকে থাকা মোটেই বরদাস্ত হচ্ছে না আমাদের।'

'আমরা কিছুই করতে পারি না। সব নির্ভর করছে "মগজের" ওপর।' বলেই চট করে এক হাঁটুর ওপর বসে পড়ে মাথা হেলিয়ে শ্রদ্ধা জানালে কিন—বোধ হয় "মগজের" উদ্দেশেই। সঙ্গে সঙ্গে বাকী চারজনও একই ভাবে বসে পড়ে মাথা হেলালে পরম শ্রদ্ধাভরে।

'মগজ! সে আবার কি হে!' হতভম্ব হয়ে যায় ওরা তিনজনেই।

অবাক হয়ে যায় কিন, নিজেদের মধ্যেই হাত মুখ নেড়ে কিছুক্ষণ কথা বলে ওরা। তারপর শুধোয়—'তোমরা তো দেখছি দারুণ উজবুক। "মগজের" নাম শোনো নি? এ রকম আশ্চর্য মেশিনের জন্য গর্ব হয় আমাদের। আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেয় "মগজ"। আমরা শুধু প্রশ্নটা সামনে বলি। তারপরেই নির্ভুল উত্তর বেরিয়ে আসে মেশিনের মধ্যে থেকে।'

'পজিট্রনিক ব্রেন!' ধীমান বলে।

পানকিনও সায় দেয়। শুধোয়—'তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটা মেশিনের ওপর?'

কিন বলে—'মগজের কাছেই এখন তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। মিলক ছাড়া অন্য কোন গ্রহে যে মিলক জাতির মত জীবের অস্তিত্ব সম্ভব, তা আমরা এতদিন কল্পনাই করতে পারিনি। তার ওপরে এত বেশী বয়েসেও তোমরা, ইয়ে, আমাদের মতই বুদ্ধিমান। এ বড় আজব সমস্যা। যাক, মগজই এ হেঁয়ালীর সমাধান করে দেবে'খন।'

ধীমান বলে—'কিন্তু মগজ যে ভুল করবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?'

ভয়ে কালো হয়ে ওঠে কিনের মুখ। বাকী চারজনও চমকে উঠে পিছিয়ে যায় এক পা। তীক্ষ্ন স্বরে ধমকে ওঠে কিন—'আজে বাজে কথা বল না। ফলাফলের জন্য শেষে পস্তাতে হবে প্রত্যেককেই।'

থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে আসে ঘরের মধ্যে। ধীমান তো বুঝেই পায় না এমন কি কথা সে বলেছে যার জন্যে ছেলে পাঁচটা এতটা চমকে উঠল। তখনও ওরা কি রকম যেন দয়ামায়াহীন চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল এদের পানে।

দারুণ রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে পানকিন। এই ক্ষুদে পুলিশ বাহিনীর ভারিক্কী চালচলনে এমন একটা স্পর্ধিত ভাব আছে, যা আর উপেক্ষা করা চলে না কোনমতেই।

হঠাৎ ব্রোঞ্জের দরজা উঠে গেল ওপরে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল আর একদল মিলকবাসী ছেলে। প্রত্যেকের পরনে গাঢ় নীল রঙের ইউনিফর্ম।

ওদের একজন এগিয়ে এসে উদ্ধত স্বরে কথা শুরু করল—'কিহে কিন, এদের

কথাই বলছিলে বুঝি ? তা বেশ, তোমরা তিনজনেই এস—জল্দি। কোন খেলনা নেওয়ার দরকার নেই। চটপট চলে এস পিছু পিছু।'

আচমকা দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে ধীমান। পানকিনের মুখ দেখে লাইলাও ফিক করে হেসে ফেলে। তিন বছর বয়সের গণ্ডী পেরোনোর পর সাত ফুট লম্বা পানকিনের সাথে এভাবে আর কেউ কথা বলেনি। আরক্তিম মুখে পানকিন একবার তাকায় ধীমানের দিকে—রগের শিরাগুলো অবরুদ্ধ ক্রোধে দড়ির মত ফুলে উঠেছে। উদ্ধত ছেলেটা তো অধীর হয়ে ওর টিউনিক ধরেই টানাটানি শুরু করে দেয়। পানকিনের প্রবল ইচ্ছা হয় ফাজিল ছেলেটার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা থাপ্পর বসিয়ে দেওয়ার। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় ও।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে আবার গাড়ীতে চেপে বসে ওরা। নিশ্চুপ হয়ে সবাই বসে থাকে গাড়ীর মধ্যে। এপথ ওপথ ঘুরে টানেলের মধ্যে দিয়ে, ব্রীজের ওপর দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা যন্ত্রযানটা এসে থামে মস্ত বড় একটা প্রাসাদের সামনে।

তড়াক করে নীল ইউনিফর্ম পরা ছেলেটা নেমে পড়ে হাঁকডাক শুরু করে দেয়—'নেমে পড়, নেমে পড়, জলদি বেরিয়ে এস। দেরী করলে একটাও খেলনা পাবে না।'

আর একবার আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে পানকিনের। মুখ বুঁজে নেমে আসে অতি কষ্টে মেজাজ সামলে।

রক্ষীর পেছন পেছন বিরাট একটা হলঘরে এসে পেঁছোয় ওরা। সে যে কত বড় হলঘর, তা লিখে বোঝানো যায় না। ছাদটা যে কত উঁচুতে, তা ভাল করে দেখাই গেল না। মনে হল, একটা রকেট-বিমান অনায়াসেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সেখানে। তিন পাশের দেওয়াল যে কতদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার হদিশ পাওয়া গেল না। লম্বা লম্বা শিকলে ঝুলছে ডিমের মতো আকারের বিরাট বিরাট স্ফটিক খণ্ড—ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত মোলায়েম কিন্তু জোরালো আলোয় ঝলমল করছে সমস্ত ঘরটা।

ঘরের ঠিক মাঝখানেই বসানো অতিকায় একটা মেশিন। কত রকমের জটিল যন্ত্রপাতি খটাখট্ ঝনাঝন্ শব্দে ঘুরে চলেছে মেশিনটার মধ্যে। কত রকমের আলো জ্বলছে নিভছে ; মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে চোখ ধাঁধানো হলুদ রঙের বিদ্যুৎ-লেখ ; বিচিত্রদর্শন অগুন্তি ডায়ালে রকমারি মিটারের কাঁটা থির থির করে কাঁপছে বা ঘুরছে। অনেকগুলো চিকমিকে পর্দায় অনেক রকম রেখাচিত্র ফুটে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মেশিনের নিচের অংশে বিরাট একটা কালো পর্দা, চারধারে সাজানো রয়েছে অসংখ্য সুইচ আর মাইক্রোফোন।

এত বড় পজিট্রনিক ব্রেন পানকিন বা ধীমান এর আগে কখনও দেখেনি।

মেশিনের সামনে নীল ইউনিফর্ম পরা আর একজন ছেলে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে খুব ব্যস্তভাবে কথা বলছিল। একটু শুনেই ওরা বুঝল যে

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছেলেটা ইংরেজী শেখাচ্ছে মগজকে।

উদ্ধত ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—'ওহে, চটপট সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যাও ওখানে।' একপাশে কাঠগড়ার মতো একটা মঞ্চের দিকে আঙুল তোলে সে। 'এক এক করে ডাকলে নেমে এসে ঐ মাইক্রোফোনটার সামনে দাঁড়িয়ে যা-যা প্রশ্ন শুনবে, তার সঠিক উত্তর দিয়ে দেবে, বুঝেছো ?'

ইংরেজী শেখানো শেষ হতেই ছেলেটা আঙুল তুলে ডাকলে পানকিনকে।

পানকিন নেমে যেতে ধীমান পাশের ছেলেটিকে শুধোলো—'তোমার নাম কি হে ?'

'ভাইন। আর ঐ যে ওকে দেখছ,' উদ্ধত ছেলেটার দিকে আঙুল তোলে —'ও হোল টাইন। আমরা হলাম সব রাজনীতিবিদ। শব্দটার মানে জানো তো ?'

হেসে ফেলে ধীমান—'তা জানি। তা তোমাদের এই মগজটা কার তৈরী বলো তো ?'

'আমাদের পূর্বপুরুষরা করেছে, এই শুধু জানি। এর বেশী কিছু জানি না, জানার দরকারও দেখি না।'

কঠিন ধাতব স্বরে মেশিনের মধ্যে থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে আসছিল। কোথেকে পানকিন এসেছে, কেন এসেছে, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতির কয়েকটি মামুলি প্রশ্ন, পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার খুঁটিনাটি বিবরণ—এই সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিল পানকিন অসীম ধৈর্য নিয়ে।

ধীমান শুধোয় ভাইনকে—'মগজটা চালু রাখতে তাহলে প্রচুর শক্তি অর্থাৎ power লাগে তাই না ?'

'মোটেই না। মগজের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এক কণা শক্তিও লাগে নি ওকে চালু রাখতে। মগজের আশ্চর্য ক্ষমতা তো ঐখানেই।'

কপাল কুঁচকে ওঠে ধীমানের। শিল্পে, বিজ্ঞানে, বুদ্ধিতে যতই আগুয়ান হোক না কেন মিলকবাসীরা, তবুও এক কণা শক্তি না নিয়ে অত বড় মেশিনটা আপনা হতেই চলেছে, এ ধারণাটা যেন কি রকম লাগে ধীমানের।

পানকিনের জেরা শেষ হল। এবার ডাক পড়ল লাইলার। ধীমান আবার শুধোয় ভাইনকে—'আমাদের মত বিদেশী তো আর সব সময় আসছে না এদেশে, সে সময়ে মগজকে নিয়ে তোমরা কর কি ?'

'কেন, সব রকম সমস্যার সমাধান করে দেয় সে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, অবস্থা বিশেষে আইনকানুনের পরিবর্তন, কখন কোন লোককে মিগল-ভবনে দেওয়া দরকার—সবই বলে দেয় মগজ। এ মেশিন ছাড়া এক পা-ও এগোবার ক্ষমতা নেই আমাদের।'

'মিগল-ভবন ? সেটা আবার কি ?'

এবার অবাক হবার পালা ভাইনের। চোখ কপালে তুলে বলে—'সে কী !

তোমাদের গ্রহতে মিগল-ভবন নেই ? তবে বয়স বেড়ে যখন জরায় কাবু হয়ে পড়ে মানুষগুলো, তখন তাদের নিকেশ কর কেমন করে ?'

চমকে ওঠে ধীমান। 'ইয়ে···মানে···তোমাদের মিগল-ভবনের কথাই বরং বল আগে।'

এমন মুখভঙ্গী করে ভাইন যেন এই রকমটিই আশা করেছিল সে। বলে—'যে সব ছেলেমেয়েরা বয়স বাড়ার পর একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে, কাজে লাগা ত দূরের কথা, সমাজের বোঝা হয়ে পড়ে—তাদের পাঠানো হয় মিগল-ভবনে।'

কান খাড়া করে কথাবার্তা শুনছিল পানকিন। এখন শুধোয় সাগ্রহে—'কি হয় সেখানে ?'

'মিগল-ভবনের দারুণ শক্তি তাদের অদৃশ্য করে অন্য তেজের সৃষ্টি করে। কি করে যে তা হয়, তা কেউ জানে না। আমরা শুধু মগজের নির্দেশমত ওদেরকে রেখে আসি ভেতরে, আর আপনা হ'তেই ওরা উড়ে যায়।'

'কি করে হয়, তা কেউই জানো না ? আচ্ছা, মগজ কি করে চলে তা জানো তো ?'

যেন সাপে ছোবল মেরেছে এমনিভাবে চমকে ওঠে ভাইন। চোখে মুখে আতংক ফুটে ওঠে—থর থর করে কেঁপে ওঠে সর্ব অঙ্গ। বলে—'যদি বাঁচবার সাধ থাকে, ও প্রশ্ন মনে এনো না, কাউকে জিজ্ঞেসও কর না। যারা করেছে, তাদের প্রত্যেকেই মারা গেছে তৎক্ষণাৎ। তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, মগজের সামনে ভুলেও ও প্রশ্ন কর না।'

ও সব ভাঁওতায় হঠছি না আমি, মনে মনেই বলে ধীমান। মুখে বলে—'কি করে তোমরা জানছ মগজের সব নির্দেশ একদম নির্ভুল ? একটা পুঁচকে ভাল্‌ভ্‌ও যদি খারাপ হয়, সব গণনাই তো ভুল হয়ে যাবে।'

দারুণ আতংকে ফ্যাকাশে হয়ে যায় ভাইনের মুখ—'থাম।' বেসুরো গলায় সে কী চীৎকার ! 'মগজের নির্দেশের সঠিকতা নিয়ে এভাবে আজ পর্যন্ত কেউ বাচালতা করে নি। এর পরিণাম মৃত্যু, তা যেন মনে থাকে। নিতান্ত আহাম্মক তোমরা। তাই এবারের মত মগজের কাছে এ নিয়ে নালিশ জানালাম না। কিন্তু সাবধান।'

হাঁ করে বাজখাঁই চীৎকার শুনছিল ধীমান। এবার বলে—'বেশ, তা না হয় আর নাই বললাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত কি তোমরা মগজের কোন অংশ, মানে, কোন সুইচ বা ভাল্‌ভের অদল বদল করো নি ?'

এবার একটু ঠাণ্ডা হয় ভাইন। বলে—'একেবারেই না। কোন অংশেই আমরা কোনদিন হাত দিই না। চিরকালই এক ভাবে কাজ করে চলে সে। মগজের অসাধারণ ক্ষমতা তো ঐখানেই।'

এমন সময়ে ডাক পড়ল ধীমানের।

শুরু হয় প্রশ্ন। একটার পর একটা উত্তর দিয়ে চলে সে ; আর সেই সাথে লাল-নীল-সবুজ আলোর জ্বলা নেভা, ডায়াল মিটারে কাঁটার ঘোরাফেরা উৎসুকভাবে লক্ষ্য করতে থাকে। অভিনব মেশিন সন্দেহ নেই। দেখে ঠোঁটের কোণে পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়ে ওর।

আর, তার পরেই তা মিলিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা (৫)

'জেরা শেষ হয়েছে।' কঠিন খন্‌খনে স্বরে বলে মগজ,—'তিনজনকেই এই মুহূর্তে নিয়ে যাও মিগল-ভবনে!'

পরক্ষণেই একটা তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হ'ল ঘরের মধ্যে।

পানকিন, ধীমান দু'জনেই রুখে দাঁড়াল মগজের অন্যায় নির্দেশের বিরুদ্ধে—কি অপরাধে তাদের মিগল-ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'বে, তা না বুঝিয়ে দিলে এক পা-ও নড়বে না তারা।

অপর দিকে নীল ইউনিফর্ম পরা টাইন-ভাইনের দল প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল ওদের ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে। দারুণ কথা কাটাকাটিতে অবস্থা সঙীন হয়ে উঠতে শেষকালে লাইলাই সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এল ঘরের বাইরে। এদের সম্মোহনের ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিতে আর মারামারি বাঁধায় না পানকিন। নিষ্ফল রাগে ফুলতে ফুলতে গাড়ীতে উঠে বসে।

মিগকে তখন রাত্রি নামছে। সে এক আশ্চর্য রাত। পৃথিবীর মত ঘন কালো আঁধারের চাদরে ঢাকা পড়ে না দিগ্‌দিগন্ত। এখানে গাঢ় লালচে রঙের অস্বচ্ছ অন্ধকার ঢেকে দেয় সব কিছু। তার মাঝে ম্লান বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে কাঁপতে থাকে তারার মালা।

শহরের পথঘাট জোরালো আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু সে আলো ওপর থেকে ঝোলানো বাতির আলো নয়, রাস্তা ফুঁড়ে নরম মোমের মত শুভ্র আলো সব কিছু স্পষ্ট করে তুলছে। এত দুঃখেও তাক্ লেগে যায় ধীমানের।

নার্শারীতে কিনের হাতে তাদের সঁপে দিয়ে ব্যাজার মুখে বিদায় নেয় টাইন-ভাইন প্রমুখ রাজনীতিবিদের দল। যাবার আগে মগজ ঘরের সব কথা শুনিয়ে যায় কিনকে।

দলটা চোখের আড়াল হতেই পানকিন শুধোয় কিনকে—'শুনলে তো সব? বিনা দোষে আমাদের মিগল-ভবনে পাঠাবে নিকেশ করার জন্যে। কিন্তু মগজ যে তার সিদ্ধান্তে ভুল করেনি, তা তোমরা বুঝছো কেমন করে? বিনা দোষে আমাদের সাবাড় করার নির্দেশ যে মেশিন দেয়, তাকে তো আমি অকেজোই বলব—!'

বলতে বলতে থেমে গিয়ে কিনের মুখে এই কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকে সে। নিঃসীম আতংকে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল তার মুখ। থর থর করে

কাঁপতে কাঁপতে বলে—'মরবে। তোমরা তো মরবেই, আমাকেও মারবে। যে মুহূর্তে মগজ জানতে পারবে তোমাদের সঙ্গে আমার এই সব কথা হয়েছে, তৎক্ষণাৎ আমাদের সবাইকে মরতে হবে। অতীতেও এই অপরাধে কেউ বাঁচে নি। জেনে রেখো, মগজ কখনও ভুল করে না।'

ধীমান বলে, 'তার মানে মগজ যা বলে, অন্ধভাবে তোমরা তাই তোমরা মেনে চলো, এই তো ?'

থতমত খেয়ে যায় কিন—'ইয়ে···মানে···চিরকালই মগজ আমাদের নির্ভুল উত্তর দিয়ে এসেছে, আজ পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যে জন্যে মগজের উত্তর নিয়ে আমরা অসন্তুষ্ট হতে পারি। অনেক, অনেক বছর আগে আমাদের যে পূর্ব-পুরুষরা মগজকে তৈরী করেন, জাতির পক্ষে বিপদজনক, যে কোন প্রাণীকে হত্যা করার অঢেল ক্ষমতাও তাঁরা দিয়ে যান মগজকে। তাছাড়া, মগজ যে সব নির্দেশ দিয়েছে আজ পর্যন্ত, তা মেনে চলে আমাদের উপকার ছাড়া অপকার কোনদিন হয়নি।'

পানকিন এবার শুধোয়—'আচ্ছা, ভাইনের কাছে শুনছিলাম বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা অকেজো হয়ে পড়লে তাদের পাঠান হয় মিগল-ভবনে, ব্যাপারটা কি তা তো বুঝলাম না।'

প্রশ্নটা শুনে একটু মুস্কিলে পড়ে কিন। বলে, 'দ্যাখো, আজ পর্যন্ত জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য লোক ছাড়া আর কাউকে মিগল-ভবনে পাঠায় নি মগজ, অপদার্থ লোকদের সমাজ থেকে সরানোর এই আমাদের চিরাচরিত পন্থা। পনেরো বছর বয়সে খাটাখাটুনি যখন আর পোষায় না, তখন তাদেরকে পাঠানো হয় ভেড়া চড়ানোর জন্য মাঠে। কিন্তু এক সময়, এ সামান্য কাজটুকুও আর হয় না ওদের দ্বারা। তখন তাদের আনা হয় নার্শারীতে। কয়েক বছর খেলনা নিয়ে ভুলে থাকে সেখানে। শেষে এমন দিন আসে যখন খেলাও তাদের পক্ষে অসাধ্য হয় পড়ে, খাওয়া দাওয়াও অপরের সাহায্য ছাড়া করতে পারে না। এক কথায় জীবন একটা বোঝা হয়ে ওঠে।'

'তারপর ?' শুধোয় পানকিন।

'জরা আর অকর্মণ্যতার চিহ্ন দেখতে পেলেই নার্শারী থেকে তাদের পাঠানো হয় মগজের সামনে। বয়স তখন তাদের পঁচিশ তিরিশ হবে। মগজ তাদের প্রশ্ন করে, উত্তর শোনে। আর এই উত্তর শুনেই হয় তাদের নিকেশ করার আদেশ দেয়, না হয় আরও কিছুদিনের জন্য খেলবার সুযোগ দেয়। মাঠের মাঝে তোমরা যে লোকটাকে দেখেছিলে, বয়স তিরিশ হলেও এখনও সে পুরোপুরি অকেজো হয়নি।'

এই অভিনব সমাজ বিজ্ঞান শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল ধীমান। এখন শুধোয়—'মিগল-ভবনটা আদতে তাহলে কী ?'

'আসল ব্যাপার আমরা কেউই জানি না। ভেতরে তো কোন দিন ঢুকিনি।

তবে যারা একবার গেছে, তারা আর বাইরে আসেনি। মগজের আদেশ মত আমরা শুধু অপদার্থ লোকগুলোকে ভেতরে পাঠিয়েই খালাস। এই ভাবে হাজার হাজার লোককে পাঠিয়েছি ভেতরে, কেউই আজ পর্যন্ত বাইরে আসেনি।'

'কিন্তু হয় কি সেখানে ? জলজ্যান্ত লোকগুলো সত্যি সত্যিই কি বাতাসে মিশে যায় ?' অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ধীমান।

'তা আমরা জানি না, আমাদের জানতেও নেই। মিগল-ভবন বা মগজের রহস্য কি, এ প্রশ্ন যারা করেছে তারাই মারা গেছে হঠাৎ।'

'কি ভাবে মরে ?'

'হয় তাদের মাথাটা থেঁতলে যায়, আর না হয় হৃৎপিণ্ডটা এফোঁড় ওফোঁড় করে থাকে একটা লোহার শলাকা।'

'তা কি করে সম্ভব !' অবাক হয়ে যায় ধীমান। 'নিশ্চয় তা'হলে তাদের কেউ খুন করে। খুনীকে ধরার কোন চেষ্টাই কি হয় না ?'

'না, মগজের ইচ্ছায় মৃত্যু হয় অপরাধীর,' ধীর স্বরে বলে কিন।

'তোমার মুণ্ডু !' চটে ওঠে পার্নাকিন। 'এক পাল অপোগণ্ডর কাছ থেকে এর বেশী আর কিছু আশা করাই বাতুলতা।'

গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়ায় কিন। 'এভাবে তোমাদের সঙ্গে আমার আর কথা বলা উচিত হয়। রাত্রে আমরা কাউকে মিগল-ভবনে পাঠাই না। কাজেই রাতটুকু বিশ্রাম করে নাও। সকালে এসে আমি নিয়ে যাব তোমাদের।' বলে এমন অবিশ্বাস্য ভারিক্কী চালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যে কিছুক্ষণ পার্নাকিনের মুখে আর কোন কথাই ফুটল না।

'চটিয়ে দিলে তো ?' বললে ধীমান।

'কাঁহাতক আর এদের ডেঁপোমো শুনি বল ? যত সব এঁচড়ে পাকা ছোকরার দল।' রাগে ফুলতে থাকে পার্নাকিন। 'ওর কথাগুলো কিন্তু ধাপ্পা নয়, বুঝলে ব্যানার্জী ?'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাদের আয়ু যখন আজ রাতটুকু—'

'তখন আজ রাতেই আমাদের সটকাতে হবে।' বলে পার্নাকিন।

'কিন্তু কি ভাবে ?' শুধোয় লাইলা।

'এসো আমার সাথে।' বলে এক ঝটকায় নার্শারীর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে পার্নাকিন।

তুমুল হট্টগোল আর বুড়ো-খোকাদের উদ্দাম নাচ দেখে তো হতভম্ব হয়ে যায় লাইলা। ইতিমধ্যে ওদের মাঝ দিয়ে পথ করে অনেকটা এগিয়ে গেছিল পার্নাকিন—লাইলা আর ধীমানকে আচমকা একদল বুড়ো-খোকা কিম্ভূতকিমাকার কতকগুলো খেলনা নিয়ে সোল্লাসে ঘিরে ফেলে বোধ হয় খেলতেই আহ্বান জানায়। ওদের হাত এড়ানোর আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের অপর প্রান্তে ব্রোঞ্জের দরজার সামনে পেঁছে যায় পার্নাকিন। এবারের টাইন-ভাইনের সঙ্গে আসার

সময়ে দরজা খোলার বিশেষ কায়দাটা ও লক্ষ্য করেছিল। কাজেই কিছুমাত্র না ঘাবড়ে দরজার ডানদিকে চিহ্নিত একটা অংশ ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই মুহূর্তে দরজাটা অদৃশ্য হয়ে গেল ওপর দিকে। চট করে বেরিয়ে পড়ে পানকিন।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের ঘর থেকে কিনের গলা শোনা যায়—'কোথায় গেলে হে তোমরা? কিছু খেয়ে নাও এই বেলা।'

তারপরেই দরজা খুলে এ ঘরে উঁকি মারলে কিন।

ধীমান তাড়াতাড়ি লাইলাকে টেনে এনে খাবারের প্রশংসা শুরু করে দেয়। কিন্তু কিনের চোখে ধুলো দেওয়া বড় শক্ত। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করে—'তোমাদের আর একজন কোথায় গেল? সবচেয়ে বেয়াদব সেই লম্বা ছোকরাটাকে দেখছি না কেন?'

ধীমান চুপ। কিন নার্শারী ঘরে যায় পানকিনের খোঁজে।

ফিসফিস করে বলে লাইলা—'পানকিন তা হ'লে সত্যিই সরে পড়ল। আর আমরা—।'

'তোমাদেরও সরাচ্ছি এখুনি।' আচমকা ঘরে ঢুকে বোমার মত ফেটে পড়ে কিন। 'এত বড় স্পর্ধা, মগজের নির্দেশ অমান্য করে পালানো! যা কখনও এখানে হয়নি—তাই! না, আর এক মুহূর্তও বিশ্রাম নয়, চলো সব, এখুনি তোমাদের রেখে আসব মিগল-ভবনে।'

ঐটুকু ছেলের মুখে এত বড় হুকুম শুনে রাগ আর সামলাতে পারে না ধীমান—মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে। হয়ত মেরেই বসত, যদি না ওর মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে লাইলা সাবধান করে দিত—'ভুলো না ব্যানার্জী, এদের সম্মোহনের ক্ষমতা।'

তাও তো বটে। এক ফোঁটা একটা ছেলের কাছে জোয়ান মদ্দ পানকিনকে কি রকম নাজেহাল হ'তে হয়েছে মনে করে নিজেকে সামলে নেয় ধীমান।

পুলিশ প্রহরায় বেরিয়ে এসে অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠে পড়ে ওরা। পথ-ঘাটের সেই আশ্চর্য আলো নিভে গেছিল—চারদিক নিঝুম, অন্ধকার।

মসৃণ গতিতে যন্ত্রযান এগিয়ে চলে মিগল-ভবনের দিকে।

নয়া-মতলব (৬)

প্রশস্ত একটা চাতালের ওপর এসে দাঁড়ায় পানকিন। সামনেই এক সার ধাতুর তৈরী সিঁড়ি প্যাঁচালো স্ক্রুর মত পাক খেয়ে উঠে গেছে ওপরে।

এতক্ষণেও ধীমান আর লাইলা না আসায় অধীর হয়ে পড়ে ও। ব্রোঞ্জের দরজার বিশেষ অংশ স্পর্শ করতেই পাল্লা উঠে গেল ওপরে, আর সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চমকে উঠে পিছিয়ে আসতেই সড়াৎ করে নেমে এল পাল্লাটা।

তার দিকে পেছন ফিরে নার্শারী ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে শ্যেনদৃষ্টি বোলাচ্ছে কিন!

আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না। একলাফে সিঁড়ির ওপর উঠে পড়তেই পায়ের তলার ধাপে পিট পিট করে দুটো লাল নীল আলো জ্বলতে নিভতে লাগল। ভাল করে দেখে অবাক হয়ে গেল পানকিন।

লাল আলোটা একটা নীল রঙের তীর—মুখটা রয়েছে ওপরের দিকে। আর নীল আলোটাও একটা তীর—মুখটা রয়েছে নিচের দিকে।

ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করে পানকিন। ওপর দিকে মুখ লাল তীরের ওপর একটা পা রাখতেই আলো নিভে গেল। কিন্তু থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ধাপটা উঠতে লাগল ওপর দিকে। যত জোরে পায়ের চাপ দিতে লাগল পানকিন, ততই গতিবেগ বাড়তে লাগল ধাপটার। স্ক্রুর মত পাক খেতে খেতে তীর বেগে ওপরে উঠতে লাগল সে।

একটার পর একটা চাতাল আর করিডর পড়ে থাকে পেছনে—ধাপটা আর থামে না। কত উঁচু বাড়ী এটা?

বেশ কিছুক্ষণ পর শেষ চাতালে এসে পেঁছোয় পানকিন, আপনা হতেই ধাপটা থেমে যায়। নেমে দাঁড়ায় ও।

সরু একটা মই চাতাল থেকে উঠে গেছিল ছাদের দিকে। ভারী বুট পরে অতি কষ্টে তাই বেয়ে ওপরে উঠে মাথার ওপর বাক্সের মতো ঢাকনাটা ঠেলে ছাদে এসে দাঁড়ায়।

যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া ছাদটা। কয়েকটি টিম পাশাপাশি ফুটবল খেলতে পারে, এত বড়। ছাদের ঠিক মাঝখানে রেডিও-মাস্তুলের মত বেজায় উঁচু একটা স্তম্ভের শীর্ষবিন্দু থেকে অদ্ভুত কান্নার মত একটা শব্দ গুঙিয়ে গুঙিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। কাঁপতে কাঁপতে দূর হতে দূরান্তরে ভেসে যাচ্ছিল অদ্ভুত করুণ শব্দটা। শুনেই বোঝে পানকিন—রেডিওতে তার পালানোর খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে চারিদিকে।

অত উঁচু থেকে বহুদূর পর্যন্ত সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল। নিঝুম নগরীর এদিকে সেদিকে ছড়ানো মিটমিটে আলোগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, তারও কিছু দূরে মাঠের নিকষ আঁধারের মাঝে খানিকটা জায়গা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক মাঝখানে রুপোর তৈরী সুচালো চুরুটের মত চকচকে করছে একটা বস্তু।

রকেট বিমান—পাহারা বসেছে চারিদিকে।

এই রকেটই তার লক্ষ্য। যেভাবেই হোক, আজ রাতের মধ্যে রকেট থেকে হাতিয়ার সংগ্রহ করে উদ্ধার করতে হবে লাইলা আর ধীমানকে। কাল সকালে মিগল-ভবনে ওদের নিয়ে যাওয়ার আগেই বেধড়ক খুন জখম চালিয়ে বাঁচাতে হবে ওদের। সম্মোহন করার কোন সুযোগই আর সে দেবে না।

রেডিও-মাস্তুলের দিকে তাকাতে তারার ম্লান আলোয় মোটা একটা তারের গোছা নজরে পড়ল তার। পাশের বাড়ীর ছাদটা এ ছাদের চেয়ে অনেক নিচু,

তারের গোছাটা নেমে গেছে ঐ নিচু ছাদের দিকেই।

তারগুলোর তলা দিয়ে ছাদের কিনারা পর্যন্ত গেল পানকিন। তবুও কিন্তু হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া গেল না গোছাটার। লাফালেও কয়েক ফুট উঁচুতে থেকে যায়। মহামুস্কিল!

হঠাৎ একটা মতলব মাথায় এল ওর। তারগুলো ঢালু হয়ে নিচের ছাদে নেমে যাওয়াতে এ ছাদের কিনারা থেকে অল্প দূরেই তারের গোছাটা হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। অর্থাৎ এ বাড়ীর ছাদ থেকে যদি লম্বা একটা লাফ মারা যায়, তা'হলে শূন্যপথে তারের গোছাটা একবার আঁকড়ে ধরতে পারলেই কেল্লা ফতে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে দৌড়ে এসে লাফিয়ে ওঠে ও—বিশাল দেহটা ধেয়ে চলে শূন্য পথে। তারপরেই চোখে পড়ে চকচকে তারের গোছাটা—পরমুহূর্তেই দুই সবল মুঠিতে আঁকড়ে ধরে গোছাটা।...

দারুণ ঝাঁকানি খেয়ে দুলে ওঠে তারগুলো। এমন ভাবে ওঠা নামা করতে থাকে যে, পানকিনের ভয় হয় গেল বুঝি এবার ছিঁড়ে। আর একবার ছিঁড়লে সে যে কোথায় গিয়ে আছাড় খাবে, তা ভেবে ওর মত দুঃসাহসী মানুষও শিউরে ওঠে।

কিন্তু কিছুই হয় না। দুলুনি একটু কমে আসতেই আস্তে আস্তে হাত চালিয়ে এ ছাদের ওপর এসে লাফিয়ে পড়ে টুক করে। সেখান থেকে মই বেয়ে চাতালে। তারপর সিঁড়ির ধাপে উঠে নীল তীরে চাপ দিয়ে তীর বেগে নিচে নেমে আসতে কয়েক মিনিটও লাগল না পানকিনের।

গভীর রাতে প্রত্যেকেই ঘুমে অচেতন। কাজেই এতখানি অ্যাডভেঞ্চারের মাঝেও কারও সাথে ওর দেখা হয়নি। ভয় ছিল পথে। কিন্তু সেদিকেও ও নিশ্চিন্ত হোল পথে বেরোনোর পর। অন্ধকারে ঢাকা নির্জন পথঘাট পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল শহরের সীমানায়।

হলুদ পথ এঁকে বেঁকে মাঠের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছিল দূরের আলোকিত অংশের দিকে। মাথার ওপর তারার মালার লালাভ ঝিকিমিকি ওকে পৃথিবীর আকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারকোনা জমিটার প্রান্তে এসে দাঁড়াল পানকিন। শ'খানেক গজ দূরে সরু চুরুটের মত রকেটটা ঝলমল করছিল জোরালো আলোয়। তিন-দিকে তিনটে বর্তুলাকার সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো আলোয় অস্পষ্ট ছিল না কিছুই। প্রত্যেকটা আলোর পেছন দাঁড়িয়েছিল একজন মিলকবাসী রক্ষী।

চকিতে মতলব স্থির করে ফেলে পানকিন। হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে যায়—কিছু বোঝবার আগেই পানকিনের লোহার মুগুরের মত ঘুসির ঘায়ে হলুদ ফুল দেখতে দেখতে জ্ঞান হারায় কাছের পাহারাওলাটা। ততক্ষণে ওদিকের পাহারাওলা দু'জনও ছুটে এসেছিল। কিন্তু পলক ফেলার

আগেই দু-জনেই প্রথমজনের পদাংক অনুসরণ করে ঘুমিয়ে পড়ে মাঠের ওপর। দেহের শক্তি না থাকলেও ওদের সম্মোহনের ক্ষমতাটা তুচ্ছ করার নয়। কাজেই একটা মুহূর্তও বাজে নষ্ট করলে না পানকিন।

পথ পরিষ্কার। এর পর মই বেয়ে এয়ার-লকে পৌঁছোনো মিনিট খানেকের ব্যাপার। সেখান থেকে বোতাম টিপে বাইরের 'হ্যাচ' খুলে ভেতরে ঢোকে ও। তারপর খুলে যায় ভেতরের 'হ্যাচ'।

প্রথমেই সোজা এগিয়ে যায় অস্ত্রাগারের দিকে। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে কতকগুলো গলার স্বর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে যায় পানকিন। কণ্ট্রোলরুমের মধ্যে কারা ইংরেজীতে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

একটু দমে যায় পানকিন। বাইরের তিনজন পাহারাদার ছাড়াও যে ভেতরে আরও কয়েকজন থাকতে পারে, এ সম্ভাবনাটা একেবারেই মাথায় আসেনি ওর। গলার স্বর শুনেই বুঝল এ সঙীন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই মুস্কিল হবে এবার। পা টিপে টিপে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় কণ্ট্রোলরুমের দিকে।

'চালাতে পারব নিশ্চয়,' একজনের স্বর শোনা যায়। 'এরই অনুকরণে আরও কয়েকটা তৈরী করাও খুব কঠিন হবে না। বাস্তবিকই, আজকের দিনটা আমাদের গ্রহের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।'

'কিন্তু তা কি ঠিক হবে?' আর একজন বলে, 'এরকম মেশিন আমরা জীবনে দেখিনি। তাছাড়া চালানোর কৌশলও জানি না।'

'শিখে নেব।' গলার স্বরটা সেই উদ্ধত রাজনীতিবিদ ছোকরা টাইনের। 'তারপর পুরো একটা রকেট-বাহিনী নিয়ে ছায়াপথের সব কটা গ্রহকে আনবো আমাদের শাসনের আওতায়। বাইন ঠিকই বলেছে, আজকের দিনটা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।'

তা'হলে এই এদের মতলব! নিরপরাধী তিনজনকে হত্যা করার পর এই রকেট-বিমানের অনুকরণে একটা গোটা রকেট-বাহিনী তৈরী করে অন্যান্য গ্রহে আধিপত্য বিস্তার করার পরিকল্পনা! নিদারুণ রাগে পানকিনের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

একজন বলে—'যেমনভাবে কারুর সন্দেহ না জাগিয়ে এ গ্রহকে রেখেছি আমাদের শাসনে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য গ্রহবাসীদেরও বুদ্ধু বানিয়ে রাখা অসম্ভব হ'বে না আমাদের পক্ষে।'

সব গুলিয়ে যায় পানকিনের। সবার সন্দেহ না জাগিয়ে মিলকবাসীদের বুদ্ধু বানিয়ে শাসনে রেখেছে কারা? কিন্তু আর দেরী করা যায় না। চোখের পলক ফেলার আগেই খোলা দরজা পথে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে লাফিয়ে পড়ল প্যানেলের কাছে বসে থাকা তিনজন মিলকবাসীর ওপর। টাইন আরও দু-জন নীল ইউনিফর্ম পরা সঙ্গীর সাথে ডায়ালের ওপর ঝুঁকেছিল। আচমকা পানকিনের বিপুল দেহটা পাহাড়ের মতো আছড়ে পড়ায় সবাই মিলে হুড়মুড় করে গড়িয়ে

পড়ল এককোণে। প্রথম আঘাতেই টাইন জ্ঞান হারিয়েছিল; বাকী দু-জনকে কায়দায় আনার আগেই পানকিন বুঝলে বিরাট একটা ভুল করেছে সে।

ঘরে শুধু ওরা তিনজনই ছিল না। দেওয়ালের গা ঘেঁসে আরও জনা ছয়েক মিলকবাসী নির্বাক হয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, পানকিন তা বুঝে ওঠার আগেই ওরা এসে চেপে ধরলে ওকে।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে ক্ষেপে ওঠে পানকিন। হাত পা সমানে চালিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে প্রাণপণে। ওরা কিন্তু জোঁকের মত ওকে ধরে ঝুলতে থাকে শূন্যে।

শেষে একজন সামনে এগিয়ে এসে তীক্ষ্ন চোখে তাকাল ওর চোখের দিকে। তৎক্ষণাৎ চোখ বুঁজে ফেলল পানকিন—কিন্তু সম্মোহনের প্রভাব এড়ানো বড় কঠিন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পানকিন বুঝলে দুটো হাতই ওর বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে ওরা।

টাইনের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বাইরে হাঁক ডাক শুনে বুঝলে অচেতন পাহারাদার তিনজনও শেষ পর্যন্ত সামলে উঠেছে।

হন্তদন্ত হয়ে একজন লাল ইউনিফর্ম পরা পুলিশ উস্কোখুস্কো চুলে ভেতরে ঢুকতেই রাজনীতিবিদের একজন চড়া গলায় একটা আদেশ দেয়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায় প্রহরীটি।

'পুলিশের গাড়ী আনতে পাঠালাম কম্যাণ্ডার।' ছেলেটি এবার পানকিনের দিকে ফেরে। 'এই মুহূর্তে তোমায় রেখে আসা হ'বে মিগল-ভবনে। যদিও তোমার এ অপরাধের শাস্তি অন্যরকম হওয়া উচিত। তবুও বিদেশী বলে পলকের মধ্যে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর সুযোগই পাবে তুমি।'

বলে, অদ্ভুত ক্রূর ভঙ্গিমায় হেসে ওঠে সে। আর তারপরেই চোখে চোখে ইসারা হয়ে যায় টাইনের সাথে।

একটা নাম-না-জানা আতংকে শিউরে ওঠে পানকিনের সর্বাঙ্গ।······

বীভৎস দৃশ্য (৭)

রাতের অন্ধকারে বিশাল বাড়ীটার দিকে তাকাতে গা ছম ছম করে ওঠে ধীমানের।

থমথমে ছায়া-ছায়া আঁধারের মাঝে মূর্তিমান দানবের মত যেন ওৎ পেতে বসেছিল সে নতুন শিকারের আশায়। দেওয়ালে মস্ত বড় বড় ধাতুর পাতে বিচিত্র জ্যামিতিক নক্সার কারুকাজ। বিরাট দরজাটা যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় লোলুপ রসনা মেলে মুখ ব্যাদান করেছিল কোন হিংস্র জানোয়ারের মতো।

এই হল মিগল-ভবন। বাইরের রক্ত হিম করা ক্রূর আকৃতি দেখে লাইলাও অস্ফুট চীৎকার করে ওঠে। না জানি ভেতরে কি বিভীষিকাই ওৎ পেতে আছে তাদের জন্যে।

পায়ে পায়ে ওরা দরজা পেরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ায়। বাইরে যাও বা আধো-আলোর ছায়া মায়া পরিবেশ ছিল, ভেতরে মিশমিশে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। সেই নিঃসীম অন্ধকারের মাঝে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেও যেন দম আটকে আসতে চায়।

হঠাৎ পেছন থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে একটা শব্দ ভেসে এল। বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে।

সেই ভয়াবহ অন্ধকারের মাঝে ওরা দাঁড়িয়ে রইল পাশাপাশি। মৃত্যুর গন্ধ যেন চারিদিকে। কেমন একটা অসহ্য সোঁদা সোঁদা উৎকট গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে ওদের। প্রতি মুহূর্তে ওরা আশা করতে লাগল অশরীরী অন্ধকার এবার বুঝি দানবের রূপ ধরে লাফিয়ে পড়বে ওদের ওপর। কিন্তু কিছুই হল না। চারিদিক নিথর, নিস্তব্দ। সেই থমথমে দুঃসহ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ওরা শুধু শুনতে পেলে নিজেদেরই শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—এ ছাড়া সেই নিরন্ধ্র তমিস্রার মাঝে এতটুকু শব্দের স্পন্দনও শোনা গেল না কোনদিকে।

ফিস ফিস করে বলে লাইল—'ব্যানার্জী, কিছু একটা কর, এভাবে ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে মরব নাকি ?'

লাইলার কথায় একটু একটু করে সাহস ফিরে পায় ধীমান। সত্যই তো, পৃথিবী থেকে এতদূরে এসে কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণের অপেক্ষা করছে সে !

বলে, 'ঠিক বলেছ লাইলা। যা থাকে কপালে,। চল এগিয়ে যাই।'

দু-হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলে ওরা। বাস্তবিকই মস্ত বড় ঘরটা। অনেকক্ষণ যাওয়ার পরেও কোথাও বাধা পেল না ওরা। অন্ধকারও পাতলা হ'ল না এতটুকু।

আর, তারপরেই কড়াৎ করে তীক্ষ্ণ একটা ধাতব শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কার আর্ত চীৎকার ভেসে এল কানে।

চমকে উঠেছিল প্রত্যেকেই। কিন্তু পরক্ষণেই শব্দ লক্ষ্য করে তাকাতে দেখলে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা। বাঁ দিকে অনেক দূরে আঁধারের মাঝে সূচ্যগ্র বিন্দুর মত টিম টিম করছে আলোটা।

দু'জনেই পড়ি-কি-মরি করে দৌড়োলো সেদিকে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়েই বাধা পেল একটা পুরু লোহার জালতিতে। দেওয়ালের গায়ের খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল জালতিটা—এরই কড়াৎ শব্দটা ওরা শুনেছিল অতদূর থেকে।

জালতির ওপাশে একটা খুপরি ঘর। ঘরটা আসলে দেওয়ালের মধ্যেই মস্ত একটা কুলুঙ্গির মত। কুলুঙ্গির মুখটা লোহার জালতি দিয়ে বন্ধ করা।

পঁচিশ তিরিশ বছরের একজন মিলকবাসী যুবক ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল খুপরির মধ্যে।

আচমকা ঘরের মেঝের খানিকটা অংশ বাক্সের ডালার মত উঠে এল। চোরা

দরজা পথে পর পর বেরিয়ে এল চারজন মিলকবাসী ছেলে। কারো বয়স বারো বছরের বেশী নয়। কিন্তু চোখে মুখে সে কি ক্রুর নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি। অল্প বয়েসী হলেও বয়স্কদের সব লক্ষণই যেন ফুটে উঠেছিল তাদের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে।

অসহায় বুড়ো-খোকাটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা চারজন। আচম্বিতে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে থলির মত একটা জিনিস দিয়ে বেচারীর মুখটা ঢেকে দিলে। কিছুক্ষণ ছটফট করার পরেই নিস্পন্দ হয়ে এল তার দেহ।

আর তারপরেই যে কাণ্ডটা ঘটল, তা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করেনি!

ঘরের কোণে কাঁচের মত স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী বড় সাইজের সিন্দুকের মত একটা আধার ছিল। অসংখ্য সূক্ষ্ম যন্ত্রে বোঝাই তার চারপাশ—এপাশে ওপাশে কতকগুলি মুখ ঢাকা পাত্রে রঙিন জলের মত রাসায়নিক মিশ্রণ।

ধরাধরি করে এরা চারজন বুড়ো-খোকার দেহটা তুলে শুইয়ে দিলে স্বচ্ছ আধারের মাঝে—তারপর চাকা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলে ওপরের ঢাকা। একজন দেওয়ালের কাছে গিয়ে ঘটাঘট করে টেনে দিলে কতকগুলো সুইচ। বিদ্যুতের মত কতকগুলো ঝিলিক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল যন্ত্রগুলোর মধ্যে। আর উজ্জ্বল হলুদ রশ্মিতে ভরে উঠল স্বচ্ছ আধারটি। রশ্মির নিচে রক্ষিত দেহটিও যেন হলুদ মোমের তৈরী পুতুলের মত অপরূপ হয়ে উঠল।

এই পর্যন্ত বেশ সহজভাবে দেখছিল ওরা। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই যা ঘটনা, তা যেমনি আশ্চর্য, তেমনি ভয়ংকর।

যে ভাবে বরফ থেকে বাষ্পকণা ওঠে, ঠিক সেই ভাবে হলুদ ধোঁয়া উঠতে লাগল দেহটি থেকে। প্রথমে খুব অল্প—নজরেই আসে না। কিন্তু ক্রমশঃ বাড়তে লাগল ধোঁয়ার পরিমাণ। আর তখনই সভয়ে ওরা লক্ষ্য করলে, মোমের মত গলে গলে ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে রক্ত মাংসের দেহটি।

অবিশ্বাস্য! কিন্তু কানকে অবিশ্বাস করা চলে, চোখকে তো আর চলে না। দেখতে দেখতে বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে অত বড় দেহটা মিলিয়ে গেল ওদের চোখের সামনে—শুধু গাঢ় হলুদ ধোঁয়া কুয়াশার মত জমাট হয়ে ভাসতে লাগল স্বচ্ছ আঁধারের মধ্যে।

এ দৃশ্য আর সহ্য হ'ল না লাইলার—দুহাতে মুখ ঢাকা দিলে ও। ধীমান কিন্তু আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে রইল এই অকল্পনীয় দৃশ্যের দিকে।

ওর সম্বিৎ ফিরে আসে সুইচ টানার তীক্ষ্ন শব্দে। দেখতে দেখতে হলুদ কুয়াশার মত গ্যাসটা আঁধার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল একটা নলের মধ্যে দিয়ে—বিভিন্ন ফ্লাস্কে ভরা রঙিন রাসায়নিক পদার্থের মধ্য দিয়ে ওঠা নামা করে এগোতে লাগল। পরিশেষে, লাল রঙের জলের মত একটা তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে বুদ্‌ বুদ্‌ কেটে বর্ণহীন গ্যাসটা মিশে গেল বাতাসে।

সাগ্রহে ওরা চারজন তাকিয়েছিল লাল রঙের পদার্থটির দিকে। বুদ্‌ বুদ্‌

বন্ধ হয়ে যেতে লাল রঙ আস্তে আস্তে পালটে কমলা রঙ হয়ে গেল। চার জনেই লাফিয়ে উঠে তুলে নিলে পাত্রটি। ভাগাভাগি করে চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে দিলে টলটলে সুরার মত কমলা রঙের পদার্থটি।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছে নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করতে থাকে চারমূর্তি। আর তখনই সচমকে ধীমান লক্ষ্য করলে ওদের একজন ভাইন—মগজ ঘরের রাজনীতিবিদ্। নিজের অজান্তে অস্ফুট চীৎকার করে উঠেছিল ও. তাই শুনেই ফিরে তাকাল চার মূর্তিমান।

হেসে উঠল চারজন। ভাইন উঠে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা চাকা ঘুরিয়ে সঙ্গী তিনজনকে নিয়ে মেঝের চোরা পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখ থেকে হাত নামিয়ে বিস্ফারিত চোখে শূন্য আধারটির দিকে তাকিয়ে ছিল লাইলা।

'ও দৃশ্য আর দেখো না লাইলা, চল অন্য দিকে যাই।' বলে ধীমান।

'সহ্য হয়ে গেছে ব্যানার্জী, আর কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু বাতাসটা যেন খুব হাল্কা মনে হচ্ছে একটা গন্ধ পাচ্ছো না ?'

সুগন্ধ ! হ্যাঁ, সুগন্ধই বটে। হঠাৎ সব কিছু ভাল লাগে ধীমানের। বিভীষিকা, মৃত্যুভয়, অবসাদ—সব কিছু যেন ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল। হঠাৎ যেন দেবরাজ সভার রিমঝিম রম্য সঙ্গীতে ভরে উঠল ওর দু-কান, দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে পড়ল মোলায়েম একটা সুখাবেশ। তারপরেই যেন ঝলমলে পোশাকে ঘুমের পরীরা এসে সোনালী পালক ওদের চোখে আলতো করে বুলিয়ে গানের মত সুরে বলল—ঘুম ! ঘুম ! ঘুম !

আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে। দু'চোখ মুদে আসার আগে শুধু ক্ষণেকের জন্য লক্ষ্য করলে দেওয়ালের চাকার নিচ দিয়ে খুব পাতলা সবুজ রঙের একটা গ্যাস কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ঢুকছে ঘরের মধ্যে······

চলন্ত গাড়ীর মধ্যে অকালপক্ক ছোকরার মত মাতব্বরি চালে বকবক করছিল কিন, 'বুঝলে কম্যাণ্ডার, পালানোর চেষ্টা করে দারুণ বোকামো করেছো। আমরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় জাত। মগজের নির্দেশ মেনে চলে আজ পর্যন্ত শান্তি ছাড়া অশান্তি কোনদিন ভোগ করিনি, কাজেই—'

'শান্তি !' বোমার মতো এবার ফেটে পড়ে পার্নাকিন। 'আর তাই বিনা দোষে তিনজন মানুষকে হত্যা করে তাদের রকেট-বিমান দখল করতে তোমাদের লজ্জা হয় না ? তাই আরও কয়েকটা রকেট তৈরী করে অন্য গ্রহে আধিপত্য বিস্তার করার মতলব আঁটতে তোমাদের বিবেক বাধা দেয় না ? নিরীহ গ্রহবাসীদের শান্তি নষ্ট করাই বুঝি তোমাদের মগজের নির্দেশ ?'

হকচকিয়ে যায় কিন। 'কি বক বক করছ ? আমরা রকেট বিমান তৈরী করতে যাব কেন ? অন্যান্য গ্রহের শান্তি নষ্ট করার কোন পরিকল্পনাও আমাদের নেই।'

এবার পানকিন হতভম্ব হয়ে যায়—'দেখ কিন, একটু আগেই রকেটের কণ্ট্রোল কেবিনে শুনে এলাম তোমাদের টাইন মতলব আঁটছে এই রকেটের মতো আরও কয়েকটি রকেট তৈরী করে ছায়াপথের সব কটা গ্রহকে জয় করবে। সে কি তবে প্রলাপ বকছিল ?'

'ভুল তুমিই শুনেছ। মগজের নির্দেশ ছাড়া টাইনের কোন ক্ষমতা নেই নতুন কোন পরিকল্পনা করার। রকেট তৈরী করার কোন নির্দেশ মগজ দেয়নি। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে এরকম কোন খবর এখনও আসেনি।'

'সেই কথাই বল, এখনও তোমাদের কানে খবরটা আসেনি।' বলে পানকিন।

'মগজ ঘরের সঙ্গে পুলিশের হেড কোয়ার্টারের সরাসরি সংযোগ আছে। মগজের কোন নির্দেশই তাই আমাদের অজানা থাকে না।'

পানকিন উত্তর দেওয়ার আগেই গাড়ী এসে থামে মিগল-ভবনের সামনে। কিন ওকে নিয়ে যায় বিরাট দরজাটার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে খুলে যায় পাল্লা দুটো।

'বল, এবার কি করতে হবে আমায়,' রুক্ষ কণ্ঠে শুধোয় পানকিন।

'সিধে ভেতরে চলে যাও, তারপর কি হবে, তা জানি না।' একটু দুঃখিত ভাবেই বলে কিন। 'কি করব বলো, মগজের নির্দেশ—।'

'থাক, থাক, ঢের হয়েছে,' বলেই হন হন করে দরজা পেরিয়ে অন্ধকারের মাঝে ঢুকে যায় পানকিন। সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

আর, সেই প্রথম ঐ মিশমিশে অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী পানকিনেরও গা ছম ছম করে ওঠে। গা গুলিয়ে ওঠে উৎকট একটা গন্ধে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে মরার চাইতে ঘুরে দেখে নেওয়া যাক মিগল-ভবনটা কি জিনিস! এই ভেবেই সামনের দিকে এগোতে থাকে পানকিন। বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বহুদূরে বাঁ দিকে মিটমিটে একটা আলোক বিন্দু চোখে পড়ে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। পরক্ষণেই দুটো পা-ই কেউ যেন স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয় মেঝের সঙ্গে।

ঠিক সামনেই লোহার জালতির ওপাশে ছোট্ট একটা ঘর। জালতির এপাশে মেঝেতে লুটোচ্ছে দুটি দেহ—লাইলা আর ধীমান।

দারুণ ভয় পেয়ে যায় পানকিন।

তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে দুজনকে পরীক্ষা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ও। মরে নি কেউই। গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে দু-জন। ঘুমের মাঝেও মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে।

পানকিনের নিজেরও বড় ঘুম পেতে থাকে। বড় মিষ্টি একটা সুবাস মোলায়েম আবেশ এনে দেয় ওর তনু মনে। দেওয়ালের রন্ধ্র থেকে বেরোনো হাল্কা সবুজ গ্যাসটা বুক ভরে নিতে নিতে হাসি মুখে শুয়ে পড়ে মেঝের ওপর।···

চোখের ওপর অত্যন্ত জোরালো ঝিলিকে বড় অস্বস্তি বোধ করতে থাকে পানকিন। মাথার মধ্যে কিসের দপদপানি অসহ্য হয়ে ওঠে ওর, মুখের ভেতরটাও শুকিয়ে কেমন জানি আঠা আঠা হয়ে গেছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও হাত পা তো দূরের কথা একটা আঙুলও নাড়াতে পারল না। অতি কষ্টে কোন রকমে চোখ মেলে তাকায়।

চোখের ঠিক সামনেই মাথার ওপর সিলিং থেকে ঝুলছে মস্ত বড় পদ্মরাগ মণির মত একটা ঝকঝকে পাথর। পাথরটার আগুনের মত রাঙা অতি উজ্জ্বল লালদ্যুতিতে প্রায় অন্ধ হয়ে যায় পানকিন—তাড়াতাড়ি চোখ মুদে ফেলে। মনে পড়ে মিগল-ভবনের দৃশ্য। কিন্তু লাইলা, ধীমান—এরা গেল কোথায়?

মাথা না নাড়াতে পারলেও পাশ থেকে মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিল পানকিন। ধীমান নয় ত?

'ব্যানার্জী নাকি?' শুধোয় ও।

'হুঁ' ছোট্ট জবাব আসে পাশ থেকে। 'বড় যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়, চোখ খুলে তাকাতেও পারছি না। লাইলাও বোধ হয় পাশে আছে। লাইলা? এই লাইলা?'

যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল লাইলা—'উঃ, বড় যন্ত্রণা!'

'চমৎকার,' এত দুঃখেও হাসি পেল পানকিনের। 'মিগল-ভবনে দেখলাম দিব্বি হাসি মুখে ঘুমোচ্ছো তোমরা—আর এর মধ্যেই মাথা ধরে গেল প্রত্যেকের?'

'তুমিও গেছিলে সেখানে? উত্তেজিত স্বরে শুধোয় ধীমান। 'জ্যান্ত মানুষটাকে হলদে ধোঁয়া করে দিল দ্যাখানি?'

'জ্যান্ত মানুষটাকে হলদে ধোঁয়া করে দিল! পাগল হলে নাকি?'

ধীমান তখন সব কথা খুলে বলল পানকিনকে। 'সবুজ গ্যাসটা নিশ্চয় এক রকমের য়্যানেস্থেটিক *।'

'হ্যাঁ, য়্যানেস্থেটিক,' হঠাৎ সরু গলায় কে কথা বলে ওঠে, কথা বলার ভঙ্গিমাটা অনেকটা টাইনের মত। 'বিনা হাঙ্গামায় তোমাদের অক্ষত অবস্থায় বন্দী করার জন্যেই অজ্ঞান করেছিলাম য়্যানেস্থেটিক দিয়ে। এখন কি রকম বুঝছ?'

মাথার উপর সেই অতিকায় পদ্মরাগ মণির দ্যুতি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না পানকিন। মনে হল পায়ের দিক থেকে আসছে স্বরটা।

আবার স্বরটা শোনা যায়, 'আসলে তোমাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম আমি, না হলে এতক্ষণে—'খুক খুক হাসির শব্দ ভেসে আসে—'ঠিক যে ভাবে ঐ লোকটাকে মরতে দেখলে, ঐ ভাবেই এতক্ষণে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যেত তোমাদের দেহ।'

প্রাণপণে হাত পা মুক্ত করার চেষ্টা করে পানকিন—দারুণ ইচ্ছে হয় এক ঘুসিতে উদ্ধত ছোকরাটার চোয়ালটা আলগা করে দেওয়ার। কিন্তু বৃথা চেষ্টা,

* ক্লোরোফর্ম জাতীয় ঘুমপাড়ানি ওষুধের নাম য়্যানেস্থেটিক।

এতটুকু শিথিল হয় না ওর নাগপাশের মত কঠিন অদৃশ্য বাঁধন।

ব্যঙ্গের হাসি ভেসে আসে। 'ছটফট করো না হে বীরপুঙ্গব। নিজেদের যদি বুদ্ধিমান বয়স্ক বলেই ভেবে থাকো, তবে ওরকম ছেলেমানুষী করতে যেও না। তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছি, তার বিনিময়ে চাই তোমাদের সাহায্য। সবাই মিলে তাহলে অনায়াসেই বোকা বানিয়ে রাখতে পারব এই মহামূর্খ মিলক-বাসীদের।'

পলায়ন (৮)

সবকিছুই এবার গুলিয়ে যায় পানকিনের। এ গ্রহে এসে পর্যন্ত একটার এর একটা সৃষ্টিছাড়া সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চলেছে সে। প্রথমেই দেখল আট বছরের খোকার মতো তিরিশ বছরের জোয়ানের ছেলেমানুষী; তারপরেই দেখল বার বছরের নাবালকদের হোমরাচোমরা ভারিক্কী চালচলন; এর পরেই দেখা গেল দেশের শাসনভার এই নাবালকদের হাতে এবং বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে অনেক বেশী আগুয়ান হ'লেও নরদেহের সলিউশনে* অরুচি নেই তাদের। আর এখন বলে কিনা আদতে এরা মিলকের বাসিন্দাই নয়! তাজ্জব ব্যাপার!

ধীমানই প্রথম শান্ত স্বরে কথা শুরু করল—'দেখ ভায়া টাইন, এভাবে আড়ষ্ট হয়ে বাঁধা থাকলে বুদ্ধিশুদ্ধি আমার একদম জট পাকিয়ে যায়। লোহার শেকল-গুলো একটু আলগা করে দিলে তোমার কথাগুলো না হয় বিবেচনা করে দেখতাম।'

আবার অস্ফুট হাসির শব্দ ভেসে আসে। 'লোহার শেকল আবার কোথায়? অতটা আদিম আমাদের ভেবো না। শেকল-টেকলের রেওয়াজ আর এদেশে নেই। এক ধরনের রশ্মি দিয়ে তোমাদের নড়াচড়ার ক্ষমতা আমি কেড়ে নিয়েছি। এই দেখ।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা, হাত পা নাড়াতেও আর কোন অসুবিধে হোল না। ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে শুয়েছিল তিনজন—মাথার ওপর প্রকাণ্ড পদ্মরাগ মণির মত পাথরটা তখনও দপ্ দপ্ করছিল বটে, তবে প্রখর দ্যুতি আর ছিল না। ঘরের একপ্রান্তে মেগাফোনের মত চোঙা লাগানো একটা মেশিনের পাশে বসেছিল টাইন—একটা হাত মেশিনটার লিভারের ওপর। চোঙার মুখটা পদ্মরাগ মণির দিকে ফেরানো।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল ওরা। টাইন বললে—'কোন রকম চালাকির চেষ্টা করে লাভ নেই—মেশিন ছেড়ে আমি এক পা-ও নড়ছি না।'

মনে মনে ওর মুণ্ডপাত করে ধীমান বললে—'কিন্তু আমাদের সাহায্য যদি

---

* গ্যাস বা কঠিন পদার্থকে জলে গুললে যা হয়, তাকে সলিউশন বলে। যেমন, চিনি গোলা জল; কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস গোলা জল, যাকে আমরা সোডা-ওয়াটার বলে চিনি।

সত্যিই তোমার দরকার হয়, তাহলে প্রথমেই এই যন্ত্রটা সম্বন্ধে তোমার কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা উচিত।' বলে পকেট থেকে একটা কম্পাশ বার করল ও।

কম্পাশটা দেখেই উৎসুক হয়ে লিভারের ওপর থেকে হাতটা তুলে সামনে বাড়িয়েছিল টাইন। প্রথমটা কিছু না বুঝলেও পরমুহূর্তেই ধীমানের মতলব আর তার অজানা রইল না। কিন্তু ঐ একটি মুহূর্তের দাম তো নিতান্ত কম নয়। চোখের পলকে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে টাইনকে নিয়ে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল পানকিন—তারপরেই সশব্দে এক চপেটাঘাত। ঐ একটি চড়েই জ্ঞান হারাল বেচারা। ছেলেটার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পানকিনও অনেকটা শান্ত হয়।

তিনজনের কেউই আর বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলে না। চটপট কম্পাশটা পকেটে পুরে দরজার বাইরে পা বাড়ালে ধীমান।

মস্ত লম্বা একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। রুপোর মত চকচকে একরকম ধাতু দিয়ে আগাগোড়া সুন্দর ভাবে বাঁধানো। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে রামধনু রঙের আলোর খেলা। মসৃণ সুড়ঙ্গের গায়ে আলোর কোন উৎস দেখা গেল না। অথচ যতদূর চোখ যায় সমস্ত সুড়ঙ্গ জুড়ে ঘন ঘন আলোর রঙ পালটে যাচ্ছে। বেগুনী থেকে হাল্কা নীল হয়ে ঘন নীল। তারপর আসছে সবুজের ঢেউ, দেখতে দেখতে তা মিলিয়ে গিয়ে উজ্জ্বল হলুদ রোশনাইতে ঝিলমিল করে উঠছে রুপোলী সুড়ঙ্গ। পরক্ষণেই আসছে কমলা, তারপরেই টকটকে লালের ঢেউ। এ যেন সূর্যদেবের সাতটি রঙীন ঘোড়া-হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ঘন ঘন সাত রঙের ঝিলিক তুলছে যতদূর খুশী। রূপকথার রাজ্যেও কি এত রঙের খেলা আছে?

মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল ওরা। পানকিনের তাড়ায় সম্বিৎ ফিরে আসে সবার। লাইলা বলে—'সুড়ঙ্গটা বোধ হয় মিগল-ভবনের তলা দিয়ে গেছে।'

'আশ্চর্য নয়।' সায় দেয় ধীমান।

এরপরে আর কোন কথা হয় না। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে ওরা। যে কোন মুহূর্তে টাইনের দু'চারটে স্যাঙাতের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই বেধড়ক চড়চাপড় চালানোর জন্য পানকিন হাত দুটো তৈরী করে রাখে। কিন্তু ভাগ্য ওদের সুপ্রসন্ন—দীর্ঘ সুড়ঙ্গ একবারে ফাঁকা। কোন উৎপাতের সম্মুখীন হ'তে হল না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর 'T' এর মতো একটা সংযোগ স্থানে এসে পেঁছালো দলটা। সুড়ঙ্গের দু-পাশের দেওয়ালে সারি সারি দরজা। একটা দরজা সামান্য ফাঁক করে কৌতূহল মেটাতে গিয়ে ধীমান দেখল বিচিত্রদর্শন সরঞ্জামে সাজানো মস্ত বড় একটা ল্যাবরেটরী। আর কোন দরজা খোলার সাহস হল না ওর। ডাইনের সুড়ঙ্গ ধরে হন হন করে এগিয়ে চলে নিঃশব্দে।

হঠাৎ মাথার ওপরের একটা ফোকর দিয়ে অদ্ভুত কতকগুলো শব্দ ভেসে আসে। খটাখট্‌ কড়াৎ, ক্রিং ক্রিং—যেন মস্ত একটা মেশিন চলছে কোথাও।

আর, তারপরেই সমস্ত সুড়ঙ্গ গম্‌ গম্‌ করে উঠল একটা কঠিন খনখনে ধাতব কণ্ঠস্বরে!

'মগজ!' অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে লাইলা।

সুড়ঙ্গটা এই জায়গায় আবার দু'ভাগ হয়ে দুদিকে ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। সংযোগস্থলে বিরাট বিরাট পিপের মত গোলাকার কতকগুলো জিনিস কাৎ হয়ে পড়েছিল—ওপরে চকচকে ধাতুর ওপর সোনালী ত্রিভুজ আঁকা।

দেখেই পানকিনের কৌতূহল জাগে। দু-দিক খোলা পিপেগুলোর ভেতরে উঁকি দিতেই দেখল, যা ভেবেছিল তাই!

পিপেগুলো আসলে এক ধরনের যন্ত্রযান। ভেতরে বসার সিট রয়েছে। আর রয়েছে পায়ের কাছে জ্বলজ্বলে লাল তীর আর নীল তীর। লাল তীরের মুখটা রয়েছে যেদিক থেকে মগজের নির্দেশ আসছে, সেই দিকে। আর নীল তীরের মুখটা রয়েছে তার বিপরীত দিকে।

লাল-নীল তীরের রহস্য পানকিনের অজানা নয়। কাজেই তাড়াহুড়ো করে ওদেরকে একটা পিপে-যানে তুলে নীল তীরে পা দিয়ে চাপ দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে লাগল পিপেটা। ওরা যেমন তেমনি বসে রইল—পিপের বাইরের খোলটাই শুধু বন্‌ বন্‌ করে ঘুরতে ঘুরতে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠতে লাগল ঢালু পথ বেয়ে ওপর দিকে! কিছুক্ষণ পরে একটা চাতালের ওপর উঠে আপনা হ'তেই থেমে গেল আজব যানটা।

চটপট নেমে পড়ল সবাই। চাতালের সামনে ছোট্ট এক সারি সিঁড়ি সুড়ঙ্গের ছাদ ফুঁড়ে ওপর দিকে উঠে গেছিল।

পানকিনই প্রথমে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওপরের ডালাটা একটু খুলে প্রথমে উঁকি দিয়ে দেখে নিল ওদিকে। তারপর সম্পূর্ণ খুলে ফেলে বেরিয়ে গেল বাইরে। ধীমান আর লাইলাও উঠে আসে ওর পিছু পিছু।

বিমূঢ়ভাবে তিনজনে দৃষ্টি বিনিময় করতে থাকে। কোথায় মিগল-ভবন? আর কোথায় বা মগজ ঘর! একটা ঘন ঝোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ঘাসের মাঝে মাটির সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে চোরা দরজাটা!

সবুজ বিদ্যুৎ (৯)

কিন্তু অবাক হয়ে ফাঁকা মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলে না। প্রথমেই প্রশ্ন উঠল এখন যাওয়া যায় কোনদিকে?

উদরে সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে পানকিন—'বন্ধুগণ! টাইন-ভাইন অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব হলেও তাদের খাবারদাবারগুলো নিশ্চয় নিকৃষ্ট হবে না। সুতরাং দূরের ঐ খামার বাড়ীটায় হানা দিয়ে প্রথমেই উদরদেবকে

শান্ত করে তারপর রকেটের দিকে—রাজী সবাই ?'

'রাজী !' বলে চারপাশে সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে ঝোপ ছেড়ে ওরা ফাঁকা মাঠে পড়ে দূরের খামার বাড়ীটার দিকে এগিয়ে চলে।

কিন্তু বিধি বাম। দু-পা যেতে না যেতেই হঠাৎ মাথার ওপর আশ্চর্য একটা শব্দ জেগে উঠল। হাজার হাজার করাত এক সঙ্গে চালালে যেমন কান কালা করা প্রচণ্ড ঘস্ ঘস্ শব্দ হয়—ঠিক তেমনি। দেখতে দেখতে আশপাশ বেশ গরম হয়ে উঠল এবং হিমেল বাতাসও হঠাৎ গরম হয়ে গিয়ে যেন ক্ষেপে উঠে দারুণ দাপাদাপি শুরু করে দিলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল ওরা। মাথার ওপর ঘস্ ঘস্ শব্দটা দেখতে দেখতে কমে এল—সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মত মিলিয়ে গেল চারপাশের জমাট কুয়াশা। দিব্বি সুন্দর সবুজ ঘাসের ওপর খেলা করতে লাগল ফ্যাকাশে নব-সূর্যের মরা আলো।

কুয়াশায় গা ঢেকে যাওয়ার পথও হল বন্ধ।

'দৌড়োও।' আদেশ দিলে পানকিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খামার বাড়ীটার সামনে পেঁছে গেল ওরা। দরজার কাছেই হাবাগোবা গোছের বিশ বাইশ বছরের একজন যুবক বসেছিল। এদের রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখেই দন্তরুচি কৌমুদী প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল।

থট-রীডার কানে লাগিয়ে লাইলা বুঝিয়ে দিলে খাবার চাই।

বোকার মত ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে বুড়ো-খোকাটা ওদেরকে বাড়ীর মধ্যে একটা ঘরে নিয়ে গেল। বিভিন্ন তাকে হরেক রকমের খাবার থরে থরে সাজানো। বিনা বাক্যব্যয়ে ওরা গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে, আর নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যুবাটি।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ন স্বরে দরজার সামনে থেকে কে হেঁকে ওঠে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তীর বেগে বেরিয়ে যায় যুবাটি। পরক্ষণেই বাড়ীর পেছন থেকে কার হাঁক ভেসে আসে। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়েই চমকে উঠে পানকিন।

'পুলিশ !'

পরক্ষণেই দরজার বাইরে প্যাসেজের ওপর লিকলিক করে ওঠে একটা সবুজ বিদ্যুৎ—তৎক্ষণাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেখানকার পুরু কার্পেট।

ফায়ারিং শুরু করেছে পুলিশ বাহিনী !

ঘর থেকে বেরোনোর পথ বন্ধ। কাজেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেখানে যত আসবাব ছিল, পানকিন আর ধীমান টেনে এনে জড়ো করে দরজার সামনে। কিন্তু পালাবার পথ কোথায় ?

দরজার পাশে হাঁক ডাক ডাক শোনা যায় এবার—সঙ্গে সঙ্গে দরজা ফুটো করে একটা সবুজ বিদ্যুৎ শিখা লক লক করে ওঠে ঘরের মধ্যে, দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে কাঠের ফার্নিচারে। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটি শিখা এদিকে সেদিকে

ঝিলিক ঝিলিক করে ওঠে—দেওয়ালে শুদ্ধ আগুন ধরে যায়।

সমস্ত ঘরটা মিনিট কয়েকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আগুনের কামড় থেকেও রেহাই পায় না কেউ। দেহের নানা অংশ ঝলসে যায় ওদের। ঘন ধোঁয়া আর গরম হল্কায় দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে সবার!

বুকফাটা চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ে লাইলা—অজ্ঞান হয়ে গেছে বেচারী। ধীমানও আর সহ্য করতে পারে না।

আর, তারপরেই আগুনের হিস্ হিস্ শব্দ ছাপিয়ে আর একটা নতুন শব্দ ভেসে আসে কানে।

অগুন্তি হোস্ পাইপ একসঙ্গে খুলে দিলে যেমন বিকট সোঁ সোঁ শব্দ হয়, এ যেন ঠিক সেই শব্দ। প্রথমে খুব ক্ষীণ ছিল শব্দটা—কিন্তু যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল তার গর্জন। দেখতে দেখতে একেবারে মাথার ওপর এসে হাজির হয় সেই বিকট লক্ষ সাপের গজরানি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। ছাদ পুড়ে ফুটো হয়ে গেছিল—বৃষ্টির জল সেই ফোকর দিয়ে হুড় হুড় করে নেমে এসে দেখতে দেখতে নিভিয়ে দিলে ঘরের আগুন—শুধু গুমে গুমে ধোঁয়া উঠতে লাগল পোড়া আসবাবপত্র থেকে। সর্বাঙ্গ ভিজে যায় অভিযাত্রীদের।

তারপরেই আচমকা থেমে যায় সোঁ সোঁ শব্দটা—পলকের মধ্যে বর্ষণও হয় স্তব্ধ।

স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল পানকিন আর ধীমান। অনেকক্ষণ পরে বিড় বিড় করে বলে পানকিন—'আধুনিক দমকল বাহিনী! নকল বৃষ্টি ঝরিয়ে আগুন নেভানো! চমৎকার!'

'হুররে!' সোল্লাসে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে ধীমান। দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো জিনিসটা দেখে পানকিনেরও ইচ্ছা হল মহানন্দে দু'হাত তুলে নেচে ওঠে।

ধীমান ততক্ষণে এক ঝটকায় অনেকটা বন্দুকের মত দেখতে বিচিত্রদর্শন অস্ত্রটা নামিয়ে এনেছিল। উল্টে পাল্টে দেখেও কোন ট্রিগারের চিহ্ন দেখতে পেল না ও—শুধু হাতলের কাছে ছোট্ট একটা বোতাম।

দেওয়ালের দিকে অস্ত্রটার নল ফিরিয়ে বোতামটা টিপে দেয় ধীমান। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে।

আর, স্তম্ভিত হয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালের বিরাট ফোকরটার দিকে তাকিয়ে। কোন শিখা নেই, ধোঁয়া নেই, শব্দ নেই—বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক ছায়ার মত নিঃশব্দে বাতাসে মিলিয়ে গেছে পুরু দেওয়ালের খানিকটা অংশ।

হতভম্ব হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না। দরজায় ততক্ষণে দুমদাম লাথি পড়ছে। অচেতন লাইলাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ফুটো দিয়ে এফলাফে ওপাশে গিয়ে পড়ল ধীমান। অদ্ভুত অস্ত্র হাতে পানকিনও বেরিয়ে এল পিছু পিছু।

খোলা ঘাস জমিতে পড়ে দৌড়োবার আগেই—

'হুঁশিয়ার !'

সরু গলায় কড়া হুংকার শুনে অস্ত্রটাও বাগিয়ে ধরার সময় পেল না পানকিন। চকিতের মধ্যে ওদের ঘেরাও করে ফেললে নীল ইউনিফর্ম পরা একদল রাজনীতিবিদ্—প্রত্যেকের হাতে উদ্যত চকচকে বিদ্যুৎ-বন্দুক এবং প্রত্যেকটা নলই ফেরানো তাদের দিকে।

সব শেষ ! হতাশ হয়ে পড়ে পানকিন। অবশ দেহে বিশেষ করে অচেতন লাইলাকে নিয়ে আর বৃথা মুক্তির চেষ্টা করে লাভ নেই, অসীম ক্লান্তিতে দুই চোখ মুহে তাই ও প্রতীক্ষা করতে থাকে সবুজ বিদ্যুতের মৃত্যু-স্পর্শের।

এক সেকেণ্ড······দু'সেকেণ্ড ·····হঠাৎ মিষ্টি একটা মন মাতানো সুগন্ধ ভেসে আসে কোত্থেকে—বড় স্নিগ্ধ সৌরভ, ফোস্কার জ্বালা, দেহের শ্রান্তি, মৃত্যুভয়—সব কিছু নিমেষে মুছে গিয়ে অপূর্ব সুখানুভূতিতে ভরে ওঠে পানকিনের অন্তর। বুক ভরে গ্যাসটা নিতে নিতে ঢলে পড়ে ঘুমের কোলে···।

মিউপা (১০)

ঘুম ঘুম চোখে অনিচ্ছার সঙ্গে পানকিন মাথার ওপর দেখতে পেয়েছিল অতিকায় পদ্মরাগের প্রখর দ্যুতি। হাত পা নাড়ার একবার চেষ্টা করেছিল। তারপর আর কিছুই ভাল লাগেনি, সর্ব অঙ্গ শিথিল করে দিয়ে ঘুমের অনাবিল আনন্দে আবার তলিয়ে যেতে চেয়েছিল।···

আচমকা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে লকলকে আগুনের ছবি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছুটে যায় ওর।

'লাইলা ? ধীমান ? তোমরা আছ ?'

'উঁ'—ঘুম জড়ানো স্বরে উত্তর আসে পাশ থেকে।

হঠাৎ টাইনের সরু গলায় শোনা যায়—'হ্যাঁ, সবাই আছে। ফোস্কার চিকিৎসা করে আমিই তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম এতক্ষণ।'

'হুম্। এবার কি মতলব ?' শুধোয় পানকিন।

'নতুন কিছু নয়, গতবার বোকার মত পালাবার চেষ্টা না করলেই শুনতে সব। যাক, এখন উঠে বসতে পার তোমরা।'

সঙ্গে সঙ্গে ওদের অদৃশ্য বাঁধন খসে গেল। উঠে বসল সবাই।

ঘরের এককোণে মেশিনটার লিভারে হাত রেখে বসেছিল টাইন। পানকিন দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই হাতের ইঙ্গিতে বসিয়ে দিয়ে বললে—'ও সব চালাকির আর চেষ্টা করে লাভ নেই। যাক, যা বলছিলাম তখন। এই মহামূর্খ মিলক-বাসীদের বোকা বানাবার জন্য তোমাদের সাহায্য আমি চাই। আর—।'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলে পানকিন, 'একটা বিষয় খোলসা করে নেওয়া ভাল। তুমি কি মিলকের বাসিন্দা নও ?'

হেসে উঠল টাইন। 'সমাজ তত্ত্বের অর্থে আমি মিলকবাসী হলেও জীব তত্ত্বের অর্থে নয়। বহু বছর আগে মহাশূন্য থেকে একটা রেডিও য়্যাকটিভ অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ধুলোর মেঘ মিলকের ওপর এসে পড়ে। মিলকের জমিতে মানুষের দেহকোষ আর ক্রোমোসোমের * ওপর তেজস্ক্রিয় বস্তুর কি প্রতিক্রিয়া, তা তোমাদের অজানা নয়। কাজেই রেডিও-য়্যাকটিভ ধুলো মিলিয়ে যাওয়ার পরেই যে নতুন জাতটার জন্ম হল, তাদের দেহের ভেতরে পরিবর্তন ঘটল প্রচুর। আর সেই অর্থেই আমরা মিলকবাসী নয়। আমাদের নতুন জাতির নাম হ'ল মিউপা।'

'আমরা বলছ কেন ? তোমার সঙ্গে আরও কেউ আছে নাকি ?'

আবার হাসল টাইন—'মিলকের সব রাজনীতিবিদই মিউপা।'

রহস্য আরও জটিল হয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আজগুবী রূপ-কথা মতো মনে হয় পানকিনের কাছে।

আবার বলে টাইন—'স্বাভাবিক ভাবে ভূমিষ্ঠ মিলকবাসীদের চেয়ে সব দিক দিয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরাই "মগজ" তৈরী করি। মিলকবাসীদের দ্রুত সাবালক হওয়া আর জরাগ্রস্ত হওয়ার পন্থাও আমরা আবিষ্কার করি। মহাশূন্যে আর সময়-পথে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা আমাদেরই। টাইম-মেশিনের একটা ডিজাইন প্রায় শেষ হয়ে এল আমাদের ল্যাবরেটরীতে।'

বাধা দিয়ে বলে ধীমান—'দেখ, তোমাদের মগজের বুজরুকি আমি অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম। কোন মেশিনই "শক্তি" ছাড়া, বিশেষ করে ছোটখাট অংশের অদল বদল না হলে চিরকাল চালু থাকতে পারে না। কিন্তু মিলকবাসীদের দ্রুত জরাপ্রাপ্তির কথা কি বললে বুঝলাম না তো ?'

এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে টাইন যেন অনেকটা মূল্যবান সময় বাজে কথায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বললে—'তাহলে সবই শোন। মিউপারা যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হ'ল, দেখা গেল চার পাঁচ বছর বয়েসেই তারা অতি মাত্রায় মেধাবী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ ঐটুকু বয়েসেই বিশ বছরের যুবকের মত আগুয়ান হল তারা। কিন্তু বয়স্ক মিলকবাসীরা তা না বুঝে আমাদের ছেলেমানুষ ভেবে কোন আমলই দিলে না। কাজেই কিছু একটা করার দরকার হয়ে পড়ল।

'শুরু হ'ল গবেষণা আর পরিকল্পনা। শেষে একদিন পূর্বপুরুষরা এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করলেন যা দিয়ে সিদ্ধ হল আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের বয়েসী মিলকবাসী ছেলেরা ভাবতে লাগল মনের দিক দিয়ে আমাদের মতই তারা প্রাপ্তবয়স্ক। আর আদতে যারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের মনের গঠন হয়ে গেল একেবারে ছেলেমানুষের মত। মাছের গ্রন্থি থেকে বিশেষ এক পানীয়

---

* জীবদেহের বিশেষ এক কোষের মধ্যে কয়েক জোড়া সুতোর মত বস্তুকে বলে ক্রোমোসোম। দেহকোষের কেন্দ্র নিউক্লিয়াস আর নিউক্লিক এ্যাসিডের ওপর বংশের ধারা অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সব নিয়ে গবেষণা করে ১৯৫৯ সালে আমেরিকার দু-জন বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

তৈরী করে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের খাবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'ত। ফলে, তাদের ছেলেমেয়েরা বাহ্যতঃ আমাদের মতই হয়ে উঠল। গ্রন্থির ঐ নিষ্কর্ষটি এন্‌ডক্রিন গ্রন্থিগুলোকে* খুব তাড়াতাড়ি পুষ্ট করে তুলত—কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই মনে হ'ত ওরা সাবালক হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্রুত পুষ্টির ফলেই গ্রন্থিগুলো বিনষ্ট হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। তাই প্রথম পুরুষে বাপ মা'র মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুরুষে দেখা গেল যৌবনেই জরায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে তারা। তাতে আমাদের সুবিধে হল।'

'কেন ?' ফস করে প্রশ্ন করে বসে ধীমান।

টাইন বুঝিয়ে দিলে। 'রেডিও-য়্যাকটিভ ধুলোর বিকিরণে একটা বিরাট পরিবর্তন এল আমাদের দেহে। সেই কারণেই, দেহের আর মস্তিষ্কের কাজ সুষ্ঠু রাখার জন্যে মধ্যে মধ্যে জ্যান্ত মানুষের দেহের নিষ্কর্ষ খাওয়ার দরকার হয়ে পড়ল মিউপাদের। জীবন্ত কোষের মধ্যে এমন কতকগুলো পদার্থ আছে, যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ঐ জিনিসগুলোই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কিছুদিনের ব্যবধানে নিয়মিত এই জিনিসগুলো আমাদের শরীর গ্রহণ করতে না পারলে মৃত্যু আমাদের অনিবার্য। ভাইটামিনের সঙ্গে এই বিশেষ পদার্থগুলোর মিল আছে অনেক। কাজেই, জরায় অকেজো হয়ে পড়ার পর প্রাপ্তবয়স্কদের আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করে ফেলি। তারপর জটিল রাসায়নিক পন্থায় ভাইটামিন জাতীয় পদার্থগুলো নিষ্কাশ করে নিয়ে খেয়ে ফেলি।'

অস্ফুট শব্দে চীৎকার করে ওঠে লাইলা। গম্ভীর মুখে তার দিকে ফিরে তাকায় টাইন—'তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে রেখো প্রথমেই তাদের আমরা য়্যানেস্থেটিক দিয়ে অজ্ঞান করে নিই। কাজেই বিশ্লিষ্ট হওয়ার সময়ে কিছুই টের পায় না তারা।'

'নরমাংস খাওয়ার সেটা কোন কৈফিয়ৎ নয়।' চীৎকার করে ওঠে লাইলা।

'কৈফিয়ৎ আমি দিচ্ছি না ; ভাইটামিন যেমন তোমাদের দরকার, তেমনি নরমাংস-নিষ্কর্ষের প্রয়োজন আমাদের। জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকতে গেলে যা করা দরকার, তাকে অপরাধ বলে না—।'

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে পানকিন—'তাই বলে জলজ্যান্ত মানুষগুলোকে—'

চকিতের মধ্যে লিভারে চাপ দিলে টাইন—আর, যে অবস্থায় লাফিয়ে উঠেছিল পানকিন, সেই অবস্থাতেই আটকে গেল বেচারা। ঘুসি পাকানো একটা

---

* দেহের নল বিহীন গ্রন্থিকে বলে এন্‌ডক্রিন গ্রন্থি। নল না থাকায় গ্রন্থি বা gland-এর রস সরাসরি দেহে মিশে যায় এবং দেহের বহু পরিবর্তনের জন্য দায়ী থাকে। যেমন, দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী থাকে থাইরয়েড আর পিটুইটারী গ্রন্থি।

হাত শূন্যে তুলে দেহটি ঈষৎ সামনে ঝুঁকিয়ে, হাঁটু বেঁকিয়ে সে এক অপরূপ ত্রিভঙ্গমুরারি পোজ নিয়ে ডামি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল পানকিন! একটা আঙুল নাড়ানোর ক্ষমতাও ছিল না, লাইলার বেদম হাসি পেয়ে যায় ডানপিটে মানুষটার এই অবস্থা দেখে।

শোনা যায় টাইনের তিরস্কার—'বার বার বলছি ছেলেমানুষী করো না, কোন লাভই হ'বে না। বরং হাতে হাত মেলাও, প্রতিদানে মুক্তি পাবে প্রত্যেকেই।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখন দয়া করে বসতে দেবে কি?' শিরদাঁড়াটা বেশ টন টন করতে থাকে পানকিনের।

আবার খসে যায় অদৃশ্য বাঁধন, চোখের সামনে ভেসে ওঠে টাইনের বিদ্রূপ-হাসি ভরা মুখ।

'কি চাও তোমরা?' প্রশ্ন করে ধীমান।

'তোমাদের রকেট বিমানের নির্মাণ কৌশল। রকেটের ভেতরটা আমরা দেখেছি। কিন্তু কতকগুলো জিনিস একেবারেই বুঝলাম না। কিছুদিন চেষ্টা করলে অবশ্য অজানা কিছু থাকবে না। তবে অনর্থক সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নই আমি। তোমরা যখন রয়েছ, তোমরাই বল কি ভাবে তৈরী করতে হয়, আর কি ভাবে চালাতে হয় এই রকেট বিমান।'

নাজেহাল গুম্ মেরে বসেছিল পানকিন। এবার মুখ খোলে—'অর্থাৎ মহাশূন্য বিজয়ের একটা খসড়া পরিকল্পনা তোমাদের দিতে হবে, এই তো? রকেটের নির্মাণ কৌশল তোমাদের শিখিয়ে দেবার পর অসংখ্য রকেট তৈরী করে ছায়াপথের সব ক'টা গ্রহে বিজয়-কেতন উড়িয়ে আসবে, কেমন?'

'ঠিক তাই।' বলে টাইন।

'প্রতিদানে কি পাবো আমরা?'

'তোমাদের জীবন, স্বাধীনতা আর তোমাদের রকেট বিমান।'

চুপ করে শুনছিল ধীমান। এখনও কোন কথা বলে না।

পানকিন কিন্তু মহাসমস্যায় পড়ে। মহাকাশ বাহিনীর কম্যাণ্ডার সে। পৃথিবীর স্বার্থরক্ষার শপথ গ্রহণ করে তবে ত্যাগ করেছে পৃথিবী। নিজের জীবনের বিনিময়ে অতি প্রিয় সবুজ গ্রহকে বিক্রী করে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় কিছুতেই।

ধীর স্বরে বলে সে—'ধরো তোমাদের সব শিখিয়ে দেওয়ার পর রকেট নিয়ে ফিরে গেলাম পৃথিবীতে। দু-দিন বাদে ভুলেও গেলাম সব কিছু। তারপর কয়েক বছর বাদে তুমি তোমার মিউপা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নামবে পৃথিবীর বুকে। আর, এখনকার মতই বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি করবে সেখানে, তাই নয় কি?'

'আরে না, না।' প্রবল প্রতিবাদ জানায় টাইন। 'যে উপকার তোমরা আমাদের করবে, তার প্রতিদানে তোমাদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করব যে, পৃথিবীর এলাকায় আমরা কোনদিনই প্রবেশ করব না। বিপুল এই ছায়াপথের

অন্যান্য অগণিত গ্রহে চলবে আমাদের অভিযান।'

'প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞার দাম আর কতটুকুই বা? আজ না হয় তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখলে। তোমার বংশধরেরা সে প্রতিজ্ঞা মানতে যাবে কেন? না, এ সম্ভব নয়। প্রাণের ভয়ে পৃথিবীকে বিক্রী করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—।'

'এক মিনিট পানকিন।' বাধা দেয় ধীমান। টাইনের দিকে ফিরে বলে—'দেখ টাইন, একটা সর্তে আমরা রাজী হ'তে পারি। তোমার প্রতিজ্ঞা লিখিতভাবে দিতে হবে। কেন না, উর্দ্ধতন অফিসারদের সে লেখা দেখালে তবেই ছাড়া পাবো আমরা। রাজী থাকো তো বলো।'

ধীমানের এই অদ্ভুত সর্ত শুনে অবাক হয়ে যায় পানকিন। ভয়ের চোটে শেষে কি মুষড়ে পড়ল ধীমান? কিন্তু তা তো নয়, বরং গোপন একটা দুষ্টু অভিসন্ধি যেন চিকমিকিয়ে ওঠে ওর দুই মণিকায়।

টাইন কিন্তু এক কথাতেই রাজী। 'এ আর এমন কি কঠিন। যথারীতি দলিল সই করা হবে। দুই শক্তিপুঞ্জের মধ্যে চির শান্তির চুক্তি লেখা রাষ্ট্রীয় সনদ দিয়ে ফিরে যাবে তোমাদের দেশে। হবে তো তাতে?' উৎসুক চোখে তাকায় ও পানকিনের পানে।

সত্যিই মহা বিড়ম্বনায় পড়ে পানকিন। ধীমানের শান্তশিষ্ট ভাল মানুষের মত মুখ দেখে কিছুই বোঝাবার উপায় নেই। লাইলা কিন্তু চোখে চোখে ইসারা করে দেয় ওকে।

ইঙ্গিত বোঝে পানকিন—লাইলা ওকে রাজী হতে বলছে। নিশ্চয় ধীমানের লুকোনো চিন্তা ও পড়ে নিয়েছে।

'ঠিক আছে, তোমরা দুজনেই যখন রাজী, তখন আমার কোন আপত্তি নেই।' বলে ও।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল টাইন। 'চমৎকার!' মেশিনটার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলে—'তা হলে এখন থেকে আমরা পরস্পর বন্ধু। কিন্তু এ সব তথ্য মিউপা ছাড়া যে আর কেউ জানবে না, তা বুঝেছো নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।' অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে ধীমান। এ সব উঁচু দরের কুটনীতি পানকিনের মাথায় কোনদিনই ঢোকে না—তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে ধীমানের কাছে সব কথা শোনার জন্যে।

লাইলা শুধোয়—'কিন্তু আমরা বাইরে যাব কি ভাবে? মিগলভবন থেকে জ্যান্ত বেরোনো মানেই তো যমালয় থেকে সশরীরে ফেরা। তা কি সম্ভব?'

'সে জন্যে ভেবো না। তোমাদের মগজ-ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে মগজ নতুন নির্দেশ শোনাবে এই নিরেট বোকাগুলোকে। বলবে, যেহেতু তোমরা বিদেশী, তাই মিগল-ভবন তোমাদের জরা মুক্ত করে পুনর্জীবন দিয়েছে।'

'অর্থাৎ তোমরা যা চাও, মগজ সেই নির্দেশই দেয়?' শুধোয় লাইলা।

'বলা বাহুল্য। খামার বাড়ীতে তোমাদের দৌরাত্মোরও একটা কৈফিয়ৎ দেবে

মগজ। ফলে, মগজ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসার পর মিলকের প্রতিটি লোক সহজভাবে মেনে নেবে তোমাদের।'

ষড়যন্ত্র (১১)

মিগল-ভবনের খোলা দরজা দিয়ে পাশাপাশি ওদের তিনজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক পথচারীর ভীড় জমে গেল রাস্তায় দেখতে দেখতে। তিন তিনটে জলজ্যান্ত সুস্থ মানুষ মার্চ করে বেরিয়ে আসছে—এ দৃশ্য দেখেও যেন ওরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একজন নীল ইউনিফর্ম পরা রাজনীতিবিদ্ বেরিয়ে এসে হেঁকে উঠল—'ঘিরে ফেল এদের, একজনও যেন পালাতে না পারে। এখুনি নিয়ে চল মগজ ঘরে!'

অর্ধচন্দ্রাকারে তিন জনকে ঘিরে ফেলে মিলকবাসীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পেঁছোয় পুলিশের ত্রিভুজমার্কা গাড়ী। ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসে কিন। মুখে তার বিস্ময়, আনন্দ আর শংকার বিচিত্র ভাব তরঙ্গ।

মগজ ঘরের প্রহসন শেষ হওয়ার পর কিন নিজে এসে এদের পেঁছে দিলে রকেটে। তিনজনেই মিলকের নাগরিক পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় খুব খুশী হয়েছিল সে। দু-চারটে মামুলি কথাবার্তার পর বিদায় নেওয়ার সময়ে ধীমান বললে—'কিন, তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।'

'বেশ তো বলো।'

কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করে সোজা কাজের কথায় আসে ধীমান। মিলকে পা দেওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সবই সুন্দর করে গুছিয়ে বলে কিনকে। মিগল-ভবনের অভিজ্ঞতাও বাদ যায় না। জীবন্ত মিলকবাসীর বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা বেশ সালংকারে বর্ণনা করে।

শুনে কিন তো চটে আগুন টাইন-ভাইনের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে এমন জঘন্য কাজ করতে পারে, তা সে বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

ধীমানও নাছোড়বান্দা। নরমাংসের নিষ্কর্ষ খাওয়ার তথ্যটুকু শুনে শিউরে ওঠে কিন। বলে—'কিন্তু তেজস্ক্রিয় বস্তু সম্বন্ধে কি বলছিলে যেন? সেটা আবার কি?'

সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলে ধীমান। তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে গামারশ্মি বেরিয়ে কি ভাবে মানুষের দেহকোষের ক্রোমোসোমে পরিবর্তন এনে সন্তানসন্ততিদের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটায়—সব গুছিয়ে বলে।

এ সব বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি কিন বুঝতে পারছে বলে মনে হল না। ধীমানও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেমন করে মিউপারা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের খাবার জলের সঙ্গে মাছের গ্রন্থির নিষ্কর্ষ মিশিয়ে দেয়, কেমন করে তাদের সন্তানদের এন্ডক্রিন গ্রন্থিগুলো দ্রুত পুষ্টিলাভ করে অকালেই বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে যৌবনেই

অকর্মণ্য হয়ে পড়ে সবাই, সবই অসীম ধৈর্য নিয়ে বোঝাতে থাকে ধীমান। একটু নরম হয়ে আসে কিন। মুখ দেখে মনে হয়, একটু একটু করে যেন সে বিশ্বাস করছে এই অসম্ভব কাহিনী। ধীমান চুপ করলে পর সে শুধালো—'তোমরা তা'হলে এখন কি করতে চাও তাই বলো।'

'মগজটা বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই।'

ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়লেও বোধহয় এতটা চমকে উঠত না কিন। মগজ সম্বন্ধে ওদের অস্থিমজ্জায় বংশ পরম্পরায় যে সংস্কার বাসা বেঁধেছে, তা তো এত সহজে যাবার নয়! তাই চট করে ধীমান আবার বোঝাতে শুরু করে।

'মগজটা একবার চুরমার করে দিতে পারলেই ভেতরকার ফাঁকি প্রত্যেকে নিজের চোখেই দেখতে পাবে। যুগ যুগ ধরে ধড়িবাজ রাজনীতিবিদ্‌গুলো কিভাবে তোমাদের ঠকিয়ে আসছে, তা নিজের চোখে দেখলেই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এদের শয়তানি চক্রান্ত। চিরকালের মতো এদের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে তোমাদের জাতি। মিলকের কোন বাসিন্দার ওপর মগজের কোন জারিজুরি আর খাটবে না।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ধীমান।

কিন্তু ওর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কাজ হ'ল। কিছুক্ষণ স্তব্দ হয়ে বসে থাকার পর বলল কিন—'ঠিকই বলেছ তুমি, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম তোমায়। বিরাট একটা প্রতারণার হাত থেকে আমাদের জাতিকে মুক্তি দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তোমরা করছ, এজন্যে রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। মগজ-ঘরে যাতে তোমরা নির্বিঘ্নে ঢুকতে পার তার সব ব্যবস্থা আমি করব। এখন বলো, কখন কাজ শুরু করবে?'

'আজ রাত্রেই। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ী করে আমাদের মগজ-ভবনের সামনে পেঁছোনোর ব্যবস্থাটা শুধু করে দিও। আর ভেতরে ঢোকার পথ যে তুমি পরিষ্কার করে রাখবে সে বিশ্বাস রইল।'

'বেইমানি করব না, বিশ্বাস রেখ।' বলে গম্ভীর মুখে বিদায় নিল কিন।

সারাদিন টুকটাক আয়োজন করতে কেটে যায়। বিস্ফোরকের মস্ত বড় একটা প্যাকেট নিয়ে অনেকটা সময় কাটাল ধীমান। বিমানটার যন্ত্রপাতিগুলো তন্ন তন্ন করে দেখে নিচ্ছিল পানকিন। হঠাৎ দারুণ রাগে মুখ লাল করে উধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসে—'রাস্কেলগুলো আমাদের জ্বালানি সব বার করে নিয়েছে। ট্যাঙ্কগুলো একদম খালি!'

মোটেই উত্তেজিত হল না ধীমান। শান্ত ভাবে বলে—'মিউপারা তো আর গর্দভ নয়। প্রতিজ্ঞা না রেখে যাতে আমরা সরে না পড়তে পারি তার ব্যবস্থা করে তবে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। জ্বালানি বার করে নেওয়া মানেই পালাবার পথও বন্ধ।'

'কিন্তু যেতে তো একদিন হবেই? মহাকর্ষ ছাড়াবার মত গতিবেগ তোলার উপযুক্ত জ্বালানিও যে নেই।' নিষ্ফল আক্রোশে টাইন-ভাইনের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে থাকে পানকিন।

তারপর এক সময়ে ঘন লাল আঁধারের যবনিকা নামিয়ে এল মিলকের রাত। রকেটের নিচে একজন চালক একটা যন্ত্রযান এনে দাঁড়িয়েছিল বিকেল থেকেই। রাত গভীর হয়ে উঠতেই ওরা তিনজন নেমে এল। পানকিন নিলে বিস্ফোরকের প্যাকেটটা। আর যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তাই ছোট্ট একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার সঙ্গে নিলে ধীমান। লাইলা আর পানকিনের পকেটে রইল দুটো রিসিভার আর একটা জোরালো ফ্ল্যাশলাইট।

নির্জন নগরীর মধ্য দিয়ে তীব্র বেগে গাড়ী এসে থামল মগজ-ভবনের সামনে। কিন ওর কথা রেখেছে। প্রধান ফটকে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তারপর ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় বিনা বাধায় ওরা একটার পর একটা দরজা পেরিয়ে এগিয়ে চলল মগজ ঘরের দিকে। পথে একজন রক্ষীরও সম্মুখীন হতে হ'ল না কাউকে। কিনের ব্যবস্থার তারিফ না করে পারে না পানকিন।

মগজ ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় দুঃসাহসীরা। মিশমিশে অন্ধকারের বুক চিরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে পড়ে অতিকায় মেশিনটার ওপর।

তৎপর হয়ে ওঠে ধীমান। মেশিনটার একটা পছন্দমত খাঁজে বেশ শক্ত করে বিস্ফোরকের প্যাকেটটা বসিয়ে দেয়।

প্যাকেটটা সবে বসানো হয়েছে, এমন সময়ে সবলে এক হ্যাঁচকায় ওকে কে টেনে নিলে মেশিনের কাছ থেকে। তৎক্ষণাৎ জোরালো আলোয় ঝলমল করে উঠল সমস্ত ঘর। চকিতে ফিরে দেখলে লাইলা আর পানকিনকে ঘেরাও করেছে নীল ইউনিফর্ম পরা একদল সশস্ত্র রাজনীতিবিদ্। কিন্তু তাকে যারা জাপটে ধরেছে তাদের পরনে লাল ইউনিফর্ম।

আর, তারপরেই চোখে পড়ল অদূরে দাঁড়িয়ে হাত মুখ নেড়ে উত্তেজিতভাবে টাইনের সঙ্গে কথা বলছে কিন।

অর্থাৎ, চক্রান্ত ফাঁশ করে দিয়েছে মূর্খ-শিরোমণি কিন স্বয়ং!

খেল্ খতম (১২)

সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, রীতিমত হকচকিয়ে গেল পানকিন। সাফল্যের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এ কি বিপত্তি!

হিড় হিড় করে কয়েকজন পুলিশ ধীমানকে মেশিনের কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেল দেখে একেবারেই মুষড়ে পড়ল পানকিন। সল্‌তেতে আগুন ছোঁয়ানোর সুযোগটুকুও পেল না ধীমান। এরকম পরিস্থিতিতে হাতে নাতে ধরা পড়ার পরিণাম যে কি, সে বিষয় আর কোন সন্দেহ ছিল না ওর।

টানাটানি সত্ত্বেও প্রাণপণে রেডিও ট্র্যান্সমিটারটা আঁকড়ে ধরেছিল ধীমান।

দেখে, এত দুঃখেও হাসি পেল পানকিনের—মিগল-ভবনে ঘুম পাড়ানোর পর এরা যখন এত আদরের দেহটিকে মোমের মত গলিয়ে হলদে গ্যাস তৈরী করবে, আর সোডা ওয়াটারের মত চুমুক দেবে, তখন কোন কাজেই আসবে না অত সাধের রেডিও ট্র্যান্সমিটার !

ওদের দিকেই আসছিল টাইন আর কিন। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজন, ঘটনার আকস্মিকতায় কথা বলার মত মনের অবস্থাও ছিল না কারো। টাইনের চোখ দুটো অবরুদ্ধ ক্রোধে ধারালো ইস্পাত ফলার মত ঝক ঝক করে ওঠে।

কিন বললে—'রেডিও-য়্যাকটিভ ধুলো আর মিউপার গালগল্প যে আমি বিশ্বাস করব, এ ধরনের আশা করা তোমাদের খুবই অন্যায় হয়েছে কিন্তু। মগজ যদি ভুয়ো হ'ত, তাহলে যুগ যুগ ধরে আমাদের এত উন্নতি কি করতে পারত ?'

পানকিন আর মুখ বুঁজে থাকতে পারল না। 'মিগল-ভবনে কি হয়েছিল তা তোমাকে বলিনি ? বলিনি কি ভাবে এই শয়তান রাজনীতিবিদ্‌গুলো তোমার জাতভাইদের জীবন্ত দেহ থেকে ওষুধ বানিয়ে পান করে নিজেদের বুদ্ধি বজায় রাখে তোমাদের শাসন করার জন্যে ?'

চমকে ওঠে টাইন। পানকিন বোঝে যে কাহিনীর এ অংশটা টাইনকে শোনায় নি কিন। গভীরতম গুহ্যতত্ত্ব এ ভাবে ফাঁশ হয়ে যাওয়ায় ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে ওঠে টাইনের মূর্তি। কিন্তু এমন ভান করল যেন আত্মসম্মানে ঘা লাগায় খুবই চটে গেছে সে।

'উন্মাদ ! এ ধরনের আজগুবী কল্পনা এদের মাথার আসে কি করে ? এই মুহূর্তে পাগলগুলোকে নিয়ে যাও মিগল-ভবনে—এবার আর বাছাধনদের বেরোতে হচ্ছে না মেশিনের খপ্পর থেকে !'

টাইন যে ওদের মিছে ভয় দেখাচ্ছে না, তা গলার স্বর শুনেই বোঝে পানকিন। এবারে মিগল-ভবনে ঢুকলে আর রেহাই নেই। পানকিন তো মানস চক্ষে দেখতে পেল, টাইন-ভাইন-বাইনের দল তার বিপুল দেহটা নিয়ে বিরাট উৎসব শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ! এমন সংকট মুহূর্তেও লাইলা আর ধীমান নির্বিকার। এতটুকু ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না।

আচমকা সামনের দিকে ছিটকে গিয়ে টাইনের গাল লক্ষ্য করে দারুণ এক চড় মারে পানকিন—বিকট চীৎকার করে দু'পাক ঘুরে দড়াম করে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল ক্ষুদে মিউপাদের উদ্ধত নেতা।

গালে জ্বালা ধরানোর জন্যেই চড়টা মেরেছিল পানকিন, অজ্ঞান করার উদ্দেশ্যে নয়। তাই আছড়ে পড়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে থাকে টাইন—খবরদার ! কেউ ফায়ার করো না। জ্যান্ত নিয়ে চলো মিগল-ভবনে।'

টাইনকে ধরাশায়ী হতে দেখেই কয়েকজন পুলিশ চকচকে নল তুলেছিল পানকিনকে লক্ষ্য করে। চিৎকার শুনেই আবার নামিয়ে নিল সেগুলো।

তীক্ষ্ন, উচ্চ স্বরে আদেশ দিলে কিন। তৎক্ষণাৎ কচিমুখ পুলিশের দল ওদের ঘেরাও করে ঠেলে নিয়ে চলল দরজার দিকে। পালাবার চেষ্টা করা বাতুলতা। তাই করুণ চোখে বিস্ফোরকের প্যাকেটাকে শেষবারের মত দেখে নিয়ে বাইরে পা দিলে পানকিন।

কড়াৎ করে বন্ধ হয়ে গেল মিগল-ভবনের দরজা। ভেতরে কুচকুচে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল তিনজন।

অসহ্য সোঁদা সোঁদা গা-গুলোনো দুর্গন্ধও এবার তুচ্ছ হয়ে গেল আসন্ন মৃত্যুর শংকায়।

অন্ধকারের মধ্যেই পানকিন অনুভব করলে ধীমান মেঝের ওপর বসে পড়ে কি খুটখাট করছে। ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারে না বিশালদেহী পানকিন—'কি হে বীরপুরুষ? ভয়ের চোটে বসে পড়লে কেন?'

'হুম্! এবার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ছি।'

'ব্রহ্মাস্ত্র!'

'ঘাবড়াও মাৎ পানকিন। তুরুপ রঙ এখনও আমার হাতে।'

'সেটা আবার কি!'

'রেডিও-ট্র্যান্সমিটারটার কথা কি এর মাঝেই ভুলে গেলে বন্ধু?' খুটখাট শব্দটা সমানে ভেসে আসে।

'খুলে বল ভায়া, খুলে বল। আমি সাদাসিদে মানুষ। এত ঘোরপ্যাঁচ বুঝি না।'

'দেখ, এরকম একটা ব্যাপারের সম্ভাবনা আমি আগে থেকেই আঁচ করেছিলাম। তাই বিস্ফোরকের প্যাকেটে রুটিন মাফিক টাইম-লক লাগানো সত্ত্বেও একটা রেডিও রিলিজ লাগাতে ভুলিনি। এখানে বসে এই ট্র্যান্সমিটার থেকে বিশেষ একটা নিশানা পাঠালেই মগজ-ঘরে বিস্ফোরণ ঘটবে এখুনি।'

'সে কি হে!' সোল্লাসে চীৎকার করে ওঠে পানকিন। 'তাই বুঝি আগাগোড়া চুপ করে রয়েছে লাইলা? ব্যানার্জীর মতলব আগেই বুঝেছিলে?'

'হয়ে গেছে আমার। সবাই তৈরী?' ধীমানের স্বর শান্ত। কিন্তু কঠিন।

কেউ কোন জবাব দিলে না। কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে পানকিন।..................

আর তারপরেই গুরুগম্ভীর গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দূরের কুলুঙ্গি ঘরে আলো জ্বলে উঠেছিল—লোহার জালতিটাও সরে গেছিল দেওয়ালের খাঁজে।

এবার তৎপর হয়ে উঠল পানকিন। মগজ রেণু রেণু হয়ে এতক্ষণে বাতাসে উড়ছে। কাজেই পথ পরিষ্কার। লোহার জালতিটা দেওয়ালের খাঁজ থেকে আবার সরে আসার আগেই তীর বেগে সেদিকে ছুটে গেল পানকিন। লাইলা

আর ধীমানও পিছু নিলে।

কুলুঙ্গি ঘর থেকে যখন আর কিছু দূরে, তখন জালতিটা আবার সরতে শুরু করেছিল। সম্পূর্ণভাবে সরে এসে পথ বন্ধ করে দেওয়ার আগেই ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের চোরা পথে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল টাইনের আতংক পাণ্ডুর মুখ।

'এইবার যাদু যাবে কোথায় ?' বলে সোল্লাসে এক বিকট রণ-হুংকার ছেড়ে টাইনের পেছনে লাফিয়ে পড়ল পানকিন। সেই পিলে চমকানো হুংকার শুনেই নিশ্চয় টাইন বেচারার প্রাণ উড়ে গেছিল। কেন না তিন লাফে চোরা সিঁড়ি টপকে যখন রুপোলী সুড়ঙ্গে এসে পড়ল পানকিন, দেখা গেল, ঊর্ধ্বশ্বাসে পাঁই পাঁই করে ছুটছে টাইন। বহুজনের চীৎকারের সাথে দুমদাম ঝনাঝন শব্দ ভেসে আসছিল অনেক দূর থেকে। দৌড়োতে দৌড়োতে পানকিন দেখলে পাতলা ধুলো ভাসছে বাতাসে—রামধনু রঙের আলোক-তরঙ্গে ঘন ঘন রঙ পাল্টাচ্ছে তার। এ ধুলো যে মগজ ঘরের সে বিষয়ে আর দ্বিমত ছিল না কারো।

হঠাৎ পাশের একটা দরজা খুলে গেল, একজন রাজনীতিবিদের ফ্যাকাশে মুখ বেরিয়ে এল সেখানে! পানকিনকে দেখেই আরও ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা সোনালী পেন্সিলের মত জিনিস তুলে ধরল তার দিকে। কিন্তু আর কিছু করার আগেই পানকিনের একটি মোক্ষম ঘুসিতে ছিটকে পড়ল বেচারী। সোনালী হাতিয়ারটা তুলে নিয়ে আবার সে পিছু নিলে টাইনের। অবিশ্বাস্য বেগে বোঁ বোঁ করে টাইন তখন ছুটছে মগজ ঘরের দিকে।

আরও কয়েকবার পলায়মান রাজনীতিবিদ্‌দের সম্মুখীন হ'ল ওরা। কখনও সবুজ বিদ্যুৎ, কখনও বেগুনী আলো দিয়ে তারা জখম করতে চাইলে এদেরকে—কিন্তু তাদের চেয়েও বহুগুণে ক্ষিপ্র পানকিন প্রত্যেকবারেই হাতের সোনালী পেন্সিলের বোতাম টিপে এক ধরনের অতি উজ্জ্বল বেগুনী আলো দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে তাদের।

পিপে-যানগুলোর কাছে এসে টাইন একটা যন্ত্রযান নিয়ে গড়াতে গড়াতে উঠে গেল মগজ ঘরের দিকে। এরাও আর দেরী করলে না। চটপট একটা যানে চেপে বসে লাল তীরটা সজোরে চেপে ধরল পানকিন। বন্ বন্ করতে ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণের মধ্যেই পিপেটা উঠে এল মস্ত একটা চাতালের ওপর। তীরবেগে মগজ ঘরে ঢোকার পর যা দৃশ্য দেখলে তিনজনে তা ভোলবার নয়।

সমস্ত মেশিনটা আগাগোড়া টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ধ্বংসের সে দৃশ্য দেখলে এক কণা বুদ্ধিও যাদের আছে. তারা বুঝবে, যুগ যুগ ধরে কি ভাবে ঠকে এসেছে তারা। থারমোয়ায়নিক ভাল্‌ভ্, কনডেনশার, স্পার্ক গ্যাপ আর তারের জটিলতার বদলে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায় শুধু ছোট বড় সিঁড়ির গোলক ধাঁধা। যেখানে একজন রাজনীতিবিদ্ বসে মগজের নির্দেশ শোনাত, সেখানে শুধু একটা দোমড়ান চেয়ার। যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে শুধু ধোঁকা

লাগানোর জন্য কতকগুলো রঙীন আলো আর হুইল। এই গুলোই টিপটাপ করে জ্বলতো, হুইলগুলো খটাখট শব্দে ঘুরতো আর বিচিত্র শব্দ তরংগ তুলে বিভ্রান্ত করে তুলত মিলকবাসীদের। সব কিছু এখন ভেঙেচুরে ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে চারদিকে। বহুলোক হতবুদ্ধি হয়ে এদিকে সেদিকে ঘুরছে, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ভাঙাচোরা বিশাল মেশিনটার দিকে।

আচম্বিতে লিকলিকে একটা সবুজ বিদ্যুৎ পানকিনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে স্পর্শ করল পেছনের দেওয়াল। ঝটিতি সে দিকে ফিরে পাইন দেখলে চকচকে একটা নল হাতে দাঁড়িয়ে টাইন—ক্রোধে, ক্ষোভে, আতংকে বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ।

চিরকাল রাজনীতির ধোঁকা দিয়েই কেটেছে, অস্ত্রশস্ত্র চালানোর কোন অভ্যাসই ছিল না টাইনের। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে রীতিমত ট্রেনিং পেয়েছে পানকিন, কাজেই পলক ফেলার আগেই হাতে সোনালী পেন্সিল তুলে অব্যর্থ লক্ষ্যে পেছনের বোতামটা টিপে ধরলে সে। জ্বলজ্বলে বেগুনী রশ্মিটা হিল-হিল করে উঠল মারণ বিদ্যুতের মতো, স্পর্শ করল টাইনের দেহ। দেখতে দেখতে সমস্ত দেহটা চোখ ধাঁধানো বেগুনী আভায় ভরে উঠল। মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আর কিছু দেখা গেল না, শুধু বেগুনি আভার ঢেউ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এল দ্যুতি, তারপরে একেবারে মিলিয়ে গেল। সেই সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল মিউপা নেতার নশ্বর দেহ, মেঝের ওপর শুধু পড়ে রইল সামান্য এইটু ছাই।···

পেছনে একটা স্বর শুনে সম্বিৎ ফিরে আসে পানকিনের।

কিন বলছে—'অজস্র ধন্যবাদ···এ ভাবে আমরা প্রতারিত হয়ে এসেছি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি······তোমাদের যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো···'

'ও সব ভাবালুতার সময় নেই এখন,' দ্রুত আদেশ দেয় পানকিন। 'তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে নেমে যাও নিচের সুড়ঙ্গে। যেখানে যত মিউপা রাজনীতি-বিদ্ দেখবে, হত্যা করবে। না, কোন দয়ামায়া নেই। একজনও যদি বেঁচে থাকে, জানবে তোমরা নিরাপদ নও।'

ধীমান এগিয়ে এসে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে—'মিলকের সবাইকে জানিয়ে দাও আসল ব্যাপারটা কি। রাজনীতিবিদ্ দেখা মাত্র যেন নাগরিকরা তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে পুলিশের কাছে। জানিয়ে দাও মিলকে নতুন শান্তির যুগ এল, প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি পেল মিলক গ্রহ!'

দিন কয়েক বাদে মগজ ভবনের বাইরে লাইলা, পানকিন আর ধীমান কিনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সারবন্দী জনসাধারণকে লক্ষ্য করছিল। সার বেঁধে তারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মেশিনের ভগ্নস্তূপ দেখে বেরিয়ে আসছিল। ঢোকার সময়ে চোখে

মুখে যে শংকা নিয়ে ঢুকছে, বেরোবার সময়ে তার কোন চিহ্নই থাকছে না।

বাড়ীটার বাইরে প্রধান ফটকের ওপর মিলকের অদ্ভুত রকমের জ্যামিতিক অক্ষরে লেখা—'রাজনীতিবিদ্‌দের মৃত্যু হয়েছে। তাদের শঠতা থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা।'

মগজ ধ্বংস হওয়ার পর এ কদিন ধীমান ল্যাবরেটরী ছেড়ে কোথাও নড়ে নি। মাছের গ্রন্থি নিষ্কর্ষের গবেষণা শোনার পর থেকেই যে এক্সপেরিমেণ্টের মতলব ওর মাথায় ঘুরছিল, সেই নিয়েই খুব ব্যস্ত ছিল ল্যাবরেটরীতে। ওর অনুমানই ঠিক। বিশেষ এক রকম মাছের বিশেষ গ্রন্থিগুলো সংগ্রহ করত মিউপারা। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে দেখলে ভেড়া জাতীয় জন্তুগুলোর পিটুইটারী আর থাইরয়েড গ্রন্থির নিষ্কর্ষের প্রতিক্রিয়া মাছের এই বিশেষ গ্রন্থি নিষ্কর্ষের প্রতিক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। মিলকের অল্পবয়স্কদের এই গ্রন্থি নিষ্কর্ষ খাওয়ালে অকালে অকর্মণ্য না হয়ে তারা স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকবে। আর মাছের গ্রন্থি নিষ্কর্ষ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের না খাওয়ালেই তাদের সন্তানরাও আর অকালপক্ক হয়ে উঠবে না। কাজেই জীবন যাত্রার সহজ সুন্দর ছন্দ আবার আসবে ফিরে। দেশের শাসনভার থাকবে প্রাপ্ত-বয়স্কদের হাতেই।

মিগল-ভবন ভেঙে ফেলে সে জায়গায় সমাজের কল্যাণমূলক কিছু তৈরী করার পরিকল্পনাও হয়েছে। ছায়াপথ বিজয়ের উদ্ভট খেয়ালও আর কারো নেই।

পানকিন বলছিল—'জ্বালানিটা আবার আমাদের ট্যাঙ্কে ভরে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ কিন। তোমার উপকার—'

বাধা দেয় কিন। 'যে উপকার তোমরা আমাদের করে গেলে তার প্রতিদান কোনদিনই দিতে পারব না। দেশে ফেরার জন্যে তোমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছো, সুতরাং তোমাদের আর আটকে রাখব না। কিন্তু যাবার আগে শুধু একটি অনুরোধ—আবার এস তোমরা।'

'আসব,' বলে যন্ত্রযানের দিকে এগিয়ে যায় ধীমান। এই যানেই ওরা পৌঁছোবে ওদের রকেটে। তারপর আধঘণ্টার মধ্যেই আবার যাত্রা শুরু হবে মহাকাশের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দিকে। হাত তুলে বলে ও—'আবার আসব। এখনকার মতো বিদায়।'

'বিদায়।' হাত তুলে অভিবাদন জানায় কিন।··· □